জীবন প্রভাত।

সম্রাট্ আরংজীবের সাময়িক ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত-প্রণীত।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক্ ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৭ সাল।

[*All rights reserved.*]

জীবন-প্রভাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীবন-উষা।

"দেও করতালি, জয় জয় বলি,
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ।
ঐ যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ উষার সহ॥"
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই গজনীর অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, ও সেই সময় হইতে দুইশত বৎসরের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশই মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা এক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিলেন, বিন্ধ্যাচল ও নর্ম্মদাস্বরূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইবার সহসা কোন উদ্যম করেন নাই। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর যুবরাজ আলাউদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সেনা সহিত নর্ম্মদানদী পার হইলেন ও খান্দেশ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সহসা হিন্দু-রাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজা সন্ধির প্রস্তাব করিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল ও হিন্দুরাজা বহু অর্থ ও ইলিচপুর প্রদেশ দান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইলে তাঁহার সেনাপতি মালীক কাফুর তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন ও নর্ম্মদাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত [illegible] করেন। তথাপি আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কেবল দেবগড় ভিন্ন আর সমুদায় প্রদেশ পুনরায় হিন্দুদিগের হস্তগত হইল।

চতুর্দ্দশ খ্রীঃ শতাব্দীতে যখন টোগ্লক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার পুত্র যুনাস পুনরায় দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া সমুদায় তৈলঙ্গ প্রদেশ অধিকার করেন (১৩২৩ খ্রীঃ), পরে মহম্মদ টোগ্লক নাম ধারণ করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস পান। দেবগড়ের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন ও সমস্ত দিল্লীবাসিদিগকে তথায় যাইবার আদেশ দিলেন। পীড়া ও নানাস্থানে বিদ্রোহ কারণ যখন এই প্রয়াস নিষ্ফল হইল তখনও সম্রাট্ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলেন না। সুতরাং দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। তৈলঙ্গ প্রদেশ জয়ের পর সেই স্থানের কতকগুলি হিন্দু নিবাসী বিজয়নগরে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া একটী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৩৫); ও জফীরখাঁ নামক একজন মুসলমান তৈলঙ্গের রাজার সহায়তায় দিল্লীর সেনাপতি উম্মাদউলমুলককে তুমুল সংগ্রামে পরাভূত করিয়া দৌলতাবাদে একটী স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৪৭)। কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটী প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল ও প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোনও চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু এই বিপদ্ হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দু-সাম্রাজ্য বিপদ্‌শূন্য ছিল না। হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমান রাজ্যকে স্থান দিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয় জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিল। কথিত আছে দৌলতাবাদের প্রথম রাজা জফীর খাঁ পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন, ব্রাহ্মণবালকের বুদ্ধিবল দেখিয়া তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেন। পরে যখন জফীর খাঁ রাজা হইলেন তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে আপন কোষাধ্যক্ষ করেন ও সেই কারণে জফীরের বংশ বাহমিনী (ব্রাহ্মণীয়) বংশ বলিয়া খ্যাত। কালক্রমে দৌলতাবাদ রাজ্য বৰ্দ্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল, ও একটীর স্থানে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটী মুসলমান-রাজ্য হইয়া উঠিল। ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে বাহ্মিনী বংশ ও দৌলতাবাদ রাজ্য লোপপ্রাপ্ত হইল, ও মুসলমান রাজগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে টেলিকোটা বা রক্ষিত গণ্ডীর যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দু-রাজ্যের লোপ সাধন করিলেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা এক

প্রকার বিলুপ্ত হইল ও বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটী মুসলমান-রাজ্য প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের হিন্দু-রাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ আকবর পুনরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন, ও তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্ত খন্দেশ ও আহম্মদনগর রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লী-সৈন্যের হস্তগত হয়। তাঁহার পৌত্র শাহজিহান ১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র আহম্মদনগর রাজ্য অধিকৃত করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটী পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল।

এই সমস্ত রাজবিপ্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদিগের জানা আবশ্যক। মুসলমান-রাজ্যের অধীনে, অর্থাৎ প্রথমে দৌলতাবাদের, পর আহম্মদনগর বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের দেশশাসন-কার্য্য অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল, ও সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখন কখন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কার্য্যকারিগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। মহারাষ্ট্র-দেশ পর্ব্বত-সঙ্কুল, ও সেই সমস্ত পর্ব্বতচূড়ায় অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। মুসলমান সুলতানগণ সেই সকল পর্ব্বত-দুর্গও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিতে সঙ্কুচিত হইতেন না; কিল্লাদারগণ কখন কখন রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন, কখন বা চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমির জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন মুসলমান সুলতানদিগের অধীনে অনেক হিন্দু-মনসবদার ছিলেন, তাঁহারা শত কি দ্বিশত কি পঞ্চশত কি সহস্র কি তদধিক অশ্বারোহীর সেনাপতি, সুলতানের আদেশমতে সেই সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধসময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন, ও সৈন্যের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য এক একটী জায়গীর ভোগ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনা শীঘ্রগতিতে ও ত্বরিতযুদ্ধে অদ্বিতীয়, ও নিজ নিজ সুলতানদিগকে যুদ্ধসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; সময়ে সময়ে তাঁহারা আপনামধ্যেও ঘোরতর বিবাদে লিপ্ত হইতেন। বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে চন্দ্ররাও মোরে দ্বাদশ সহস্র পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন ও

সুলতানের আদেশে নীরা ও বার্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। সুলতান পরিতুষ্ট হইয়া সেই দেশ চন্দ্ররাওকে অল্পমাত্র কর ধার্য্য করিয়া জায়গীর স্বরূপ দান করেন ও চন্দ্ররাওয়ের সন্ততিগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা খেতাবে সেই প্রদেশ স্বচ্ছন্দে সুশাসন করেন। এইরূপ রাওনায়েক নিম্বালকর বংশ পুরুষানুক্রমে ফুল্তন দেশের দেশমুখ হইয়া সেই দেশ শাসন করেন। এইরূপে ঘাটিগী বংশ মল্লওরী প্রদেশে, মনয় বংশ মুস্বর প্রদেশে, ঘরপুরীয় বংশ কাপসী ও মুধোল দেশে, ডুফ্লে বংশ ঝট্টপ্রদেশে ও শবন্ত বংশ ওয়ারিপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়া পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের কার্য্য সাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে বা আপনাদিগের মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই; পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত, ও পর্ব্বতকন্দরে ও উর্ব্বরা উপত্যকায় সর্ব্বদাই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও সেগুলি কুলক্ষণ নহে, সেগুলি সুলক্ষণ; পরিচালনার দ্বারায় আমাদের শরীর যেরূপ সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, সর্ব্বদা কার্য্য ও উপদ্রব ও বিপর্য্যয় দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয় জীবন-উষার প্রথম রক্তিমাচ্ছটা শিবজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে যাদবরাও ও ভনশ্লে নামক দুইটী পরাক্রান্ত বংশ ছিল। সিন্ধুক্ষিরের যাদবরাওয়ের ন্যায় পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অনেকে বিবেচনা করেন দেবগড়ের প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ উদ্ভূত। ষোড়শ খ্রীঃ শতাব্দীতে লক্ষজী যাদবরাও আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনস্থ একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি ছিলেন ও প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ভন্শ্লে-বংশ যাদবরাওয়ের ন্যায় উন্নত না হইলেও একটী প্রধান ও ক্ষমতাশালী বংশ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এইস্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে যাদবরাওয়ের বংশ হইতে শিবজীর মাতা ও ভনশ্লে বংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

উপন্যাসের প্রারম্ভে দেশের ইতিহাস ও লোকের আপন অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত হইল, তাহাতে বোধ হয় পাঠক মহাশয় বিরক্ত হইবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথজী হাবিলদার।

"কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ তাহার দিব্য পঙ্কজ নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর॥
দুইদিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥"
কাশীরাম দাস।

কঙ্কণপ্রদেশে বর্ষাকালে প্রকৃতি অপরূপ ভীষণ রূপ ধারণ করে; ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে বসন্তকালেই একদিন সায়ংকালে সেই ঘোর ঘটা ও ভীষণ সৌন্দর্য্য যেন দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সূর্য্য এখন অস্ত যায় নাই, অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘবিলম্বী অতিকৃষ্ণ মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন ও চারিদিকে পর্ব্বতশ্রেণী ও অনন্ত অরণ্য দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে, আকাশ বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই, যেন জগৎ অচিরে প্রচণ্ড বাত্যা আসিবে জানিয়া ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ পর্ব্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি ঈষৎ দেখা যাইতেছে, দূরস্থ বিশাল পাদপাবৃত পর্ব্বতগুলি কেবল গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ স্বরূপ দেখা যাইতেছে, আর বহু নীচে উপত্যকা একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বত-প্রবাহিণী জলপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্যগুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কোথায় অন্ধকারে লীন হইয়া কেবল শব্দমাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে।

সেই পর্ব্বতপথের উপর দিয়া একমাত্র অশ্বারোহী বেগে অশ্বচালন করিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বের সমস্ত শরীর ফেনপূর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত, ও অশ্বারোহীর বেশ ধূলা ও কর্দ্দমময়, দেখিলেই বোধ হয় তিনি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার হস্তে বর্শা, কোষে অসি; বামহস্তে বল্গা ও বাম বাহুতে ঢাল, শরীর উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত। পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ মহারাষ্ট্রদেশীয়। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ হইবে, সচরাচর মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেক্ষা তাঁহার অবয়ব উন্নত ও বর্ণ-গৌর, কিন্তু পরিশ্রমে বা রৌদ্রোত্তাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ

হইয়াছে ও শরীর সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। যুবকের ললাট উন্নত, চক্ষুদ্বয় জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, মুখমণ্ডল ঔদার্য্যব্যঞ্জক ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অশ্বকে অল্প বিশ্রাম দিবার জন্য লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, বল্‌গা বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন, বর্শা বৃক্ষশাখায় হেলাইয়া রাখিলেন, ও হস্তদ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া ও নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ উন্নত প্রশস্ত ললাট হইতে পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া ক্ষণেক আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরাৎ তুমুল বাত্যা আসিবে তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অনন্ত পর্ব্বত ও পাদপশ্রেণী হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে ও দুই একটী স্তিমিত মেঘগর্জ্জন শুনা যাইতেছে। যুবকের শুষ্ক ওষ্ঠে দুই এক বিন্দু বৃষ্টিজলও পতিত হইল। এ যাইবার সময় নহে, আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত। যুবকের চিন্তা করিবার সময় ছিল না; তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব সহে না, তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন তিনি কোন আপত্তি শুনেন না, যুবকেরও বিলম্ব বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই। পুনরায় বর্শা হস্তে লইয়া লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। তাঁহার অসি অশ্বপৃষ্ঠে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল; আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় তীরবেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্ব্বত-প্রদেশের সুপ্ত প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা চমকিত হইল, ও মেঘের গর্জ্জনে সেই অনন্ত পর্ব্বত-প্রদেশ যেন শত বার শব্দিত হইল। অচিরাৎ কোটী-রাক্ষস-বল বিদ্রূপ করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে পবন প্রবাহিত হইল, ও যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতকেও সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। এককালে শত পর্ব্বতের অসংখ্য পাদপশ্রেণী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত ও পর্ব্বত-তরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল; ও মধ্যে মধ্যে দূরপ্রতিঘাতী বজ্র শব্দে জগৎ কম্পিত ও স্তব্ধ হইতে লাগিল। ত্বরায় মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িয়া পর্ব্বত অরণ্য ও উপত্যকা প্লাবিত করিল ও জলপ্রপাত ও তরঙ্গিণী সমুদয়কে স্ফীতকায় ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ না হইয়া বেগে চলিতে লাগিলেন, সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হইবেন, সময়ে সময়ে অন্ধকারে লম্ফ দিয়া জলস্রোত পার হইবার সময় উভয়েই সেই কঠিন প্রস্তরের উপর পতিত হইলেন, ও এক স্থানে বায়ুপীড়িত বৃক্ষশাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর উষ্ণীষ ছিন্ন ভিন্ন হইল ও তাঁহার ললাট হইতে দুই এক বিন্দু রুধির পড়িতে লাগিল। তথাপি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং যুবক মুহূর্ত্ত মাত্রও চিন্তা না করিয়া যত দূর সাধ্য সতর্কভাবে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিন চারি দণ্ড মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, ও অচিরাৎ বৃষ্টি থামিয়া গেল, ও অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের আলোকে সেই পর্ব্বতরাশি ও নবস্নাত বৃক্ষসমূহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল। যুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অশ্ব থামাইলেন ও সিক্ত কেশগুচ্ছ পুনরায় সুন্দর প্রশস্ত ললাট হইতে অপসৃত করিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে শোভা অনির্ব্বচনীয়! পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, যত দূর দেখা যায় দুই তিন সহস্র হস্ত উন্নত শিখরগুলি ক্রমান্বয়ে দেখা যাইতেছে, ও সেই পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্বে, মস্তকে, চারিদিকে, নবস্নাত নিবিড় হরিদ্ব[illegible] পাদপশ্রেণী সূর্য্যালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে [illegible] শতগুণ স্ফীতকায় হইয়া বর্দ্ধিত গৌরবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে, ও সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে। প্রতি পর্ব্বত ও শিখরের উপর সূর্য্যরশ্মি নানারূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে, আকাশে প্রকাণ্ড ধনু নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূরে বায়ুদ্বারা মেঘ তাড়িত হইয়া বৃষ্টিরূপে গলিত হইতেছে তাহাও দেখা যাইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহিলেন; পরে সূর্য্যের দিকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গপ্রবেশ করিলেন; দ্বারের ভিতর যাইলেন ও পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন সূর্য্য অস্ত হইতেছে। অমনি ঝন্ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"অধিক সকালে পঁহুছেন নাই; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অদ্য রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।"

যুবক সহাস্যে উত্তর করিলেন, "সেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই; ভবানীর প্রসাদে প্রভুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাখিব, অদ্যই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।"

দ্বাররক্ষক। "কিল্লাদারও আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

"তবে চলিলাম" বলিয়া যুবক রাজগৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন।

অনুমতি পাইয়া যুবক কিল্লাদারের প্রাসাদে যাইলেন ও সম্যক্ অভিবাদন করিয়া নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কিল্লাদার মাউলীজাতীয় একজন শিবজীর বিশ্বস্ত যোদ্ধা, তিনি লিপিগুলি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়তা করিতে পারেন ও কোন্ বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপি পাঠে সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ করিয়া কিল্লাদার অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবকের বালকোচিত সরল ও উদার মুখমণ্ডল ও আনয়নবিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ, অথচ সুদৃঢ় উন্নত অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট দেখিয়া কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন, লিপির দিকে দেখিলেন আবার বালক বা যুবার দিকে মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন, "হাবিলদার! তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে রাজপুত?"

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নমাইয়া প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। "তুমি আকৃতি ও বয়সে বালক মাত্র।" (ঈষৎ ক্রোধে রঘুনাথজীর নয়ন উজ্জ্বল হইল; দেখিয়া কিল্লাদার ধীরে ধীরে বলিলেন) "কিন্তু বিবেচনা করি কার্য্যকালে পরাঙ্মুখ নহ।"

রঘুনাথজী ঈষৎ ক্রোধকম্পিতস্বরে অথচ নম্রভাবে বলিলেন, "যত্ন ও চেষ্টামাত্র মনুষ্যসাধ্য, বোধ হয় তাহাতে প্রভু আমার ত্রুটি দেখেন নাই; সিদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন।"

কিল্লাদার। "তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে?"

স্থিরস্বরে যুবক উত্তর করিলেন, "প্রভুর নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।"

কিল্লাদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, তোমার আকৃতিতেই কার্য্যসাধনে তোমার যেরূপ যত্ন তাহার পরিচয় দিতেছে।" রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিক্ত ও ললাটের ঈষৎ ক্ষত দেখা যাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনার সমস্ত অবস্থা ও মহারাষ্ট্রীয় ও মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী যতদুর পারিলেন উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন, "তবে কল্য প্রাতে আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিবে; আর শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও, যে তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষম কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন সে হাবিলদার কার্য্যের অনুপযুক্ত নহে।" এই প্রশংসাবাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে এরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতিশয় গূঢ় রাজকীয় সংবাদ ও কতকগুলি গূঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতেছিলেন। সেগুলি সমস্ত লিপিদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি শত্রুহস্তে পড়িতে পারে। রঘুনাথজীকে সেগুলি বাচনিক বলা যাইতে পারে কি না, অর্থবলে বা কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্ত্তী হইয়া গূঢ় মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি না, কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন, পরীক্ষা শেষ হইল। রঘুনাথ নয়নপথের বহির্ভূত হইলে পর কিল্লাদার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "শিবজী এবিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত কার্য্যে যথার্থই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযুবালা।

"————————সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচল খসি, আধবদনে হাসি, আধই নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আচর ভরি, তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনয় কটোরা অতনু কাঁচল উপাম।
হরি হরি কহ মন, জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতাপাঁতি অধর মিলায়ত মৃদু মৃদু কহ তাহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে দুঃখ রহ, হেরি হেরি না পূরাল আশা॥"
বিদ্যাপতি।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদায় পাইয়া ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অল্পদিন পরই শিবজী ভবানীর একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ও অম্বরদেশীয় অতি উচ্চকুলোদ্ভব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না, দেবীকে পূজা দেওয়া ও পুরোহিতের নিকট যুদ্ধের ফলাফল জানাই রঘুনাথকে পাঠাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত আপন কৃষ্ণকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটী যুদ্ধগীত মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন; মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে, মন্দিরপার্শ্বস্থ ছাদে সহসা তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, সহসা তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল! দেখিলেন সেই ছাদে একজন অনুপম লাবণ্যময়ী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা একাকী আসীনা রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া অস্তাচলের রক্তিমা শোভা অনিমেষে দৃষ্টি করিতেছেন। কন্যার রেশমবিনিন্দিত সুমার্জ্জিত অতি কৃষ্ণকেশপাশ গণ্ডস্থলে, হস্তোপরি ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে ও উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও ভ্রমরবিনিন্দিত চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়াছে। ভ্রূযুগল যেন তুলিদ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের শোভা সাধন করিতেছে! ওষ্ঠদ্বয় সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, উন্মত্তপ্রায় হইয়া রঘুনাথ সেই ওষ্ঠদ্বয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হস্ত ও বাহু সুগোল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, ও সুবর্ণের বলয় ও কঙ্কণদ্বারা সুশোভিত।

কন্যার ললাটে আকাশের রক্তিমাটচ্ছা পতিত হইয়া সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বল করিতেছে। কণ্ঠ ও ঈষদুন্নত বক্ষঃস্থলের উপর একটী কণ্ঠমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। রঘুনাথ! রঘুনাথ! সাবধান! তুমি রাজকার্য্যে আসিয়াছ, তুমি দরিদ্র, একজন সৈন্যমাত্র, ওদিকে চাহিও না, ওপথে যাইও না! রঘুনাথ এ সকল বিবেচনা করিতেছিলেন না, তিনি মুগ্ধের ন্যায় অনিমেষলোচনে সেই সায়ংকালের আকাশপটে অঙ্কিত অনুপম ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতেছিল, পূর্ব্বে যে ভাব কখনও জানেন নাই, অদ্য সহসা সেই নব ভাবের উদ্রেকে হৃদয় মুহুর্মুহুঃ সজোরে আহত হইতেছিল; সময়ে সময়ে একটী দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছিল। যৌবনপ্রারম্ভে প্রথম প্রেমের দুর্দ্দমনীয় বেগে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়!

যতক্ষণ দেখা গেল, রঘুনাথ প্রস্তরবৎ অচল হইয়া সেই সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৈকালিক আকাশ-শোভা ক্রমে লীন হইয়া গেল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির উপর পড়িতে লাগিল, রঘুনাথ তখনও দণ্ডায়মান!

সন্ধ্যার সময় কন্যা গৃহে যাইবার জন্য উঠিলেন, দেখিলেন অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় অতি সুগঠন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দিকে অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন। ঈষৎ লজ্জায় কন্যার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন, যুবক সেইরূপ বক্ষের উপর বামহস্ত স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে, কোষে খড়্গ, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা, ও অনিমেষলোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মুহূর্ত্তের জন্য রমণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তৎক্ষণাৎ মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন রঘুনাথ যেন চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন, ললাট হইতে দুই এক বিন্দু স্বেদ মোচন করিলেন, মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা পুরোহিতের পরিচয় দিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অম্বরদেশীয় উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম জনার্দ্দন দেব। তিনি অম্বরের রাজা প্রসিদ্ধ জয়সিংহের এক-

জন সভাসদ্ ছিলেন, ও শিবজীর বহু অনুরোধে, জয়সিংহের অনুমত্যনুসারে শিবজীর সর্ব্বপ্রথম বিজিত তোরণদুর্গে আগমন করেন। তাঁহার পুত্রকন্যা কেহই ছিল না, কিন্তু স্বদেশত্যাগের অচিরকাল পূর্ব্বেই তিনি এক ক্ষত্রিয়কন্যার লালনপালনের ভার লইয়াছিলেন। কন্যার পিতা জনার্দ্দনের আশৈশব পরমবন্ধু ছিলেন; কন্যার মাতাও জনার্দ্দনের স্ত্রীকে ভগিনী সম্বোধন করিতেন। সহসা উভয় পিতামাতার কাল হওয়ায় নিঃসন্তান জনার্দ্দন ও তাঁহার গৃহিণী ঐ শিশু ক্ষত্রিয়বালার লালনপালনভার লইলেন; ও তোরণদুর্গে আসিয়া সেই শিশুকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন।

পরে জনার্দ্দনের স্ত্রীর কাল হইলে কন্যা সরযু ভিন্ন বৃদ্ধের স্নেহের দ্রব্য আর কেহ রহিল না; সরযুবালাও জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ও ভাল বাসিতেন। কালক্রমে সরযুবালা নিরুপমা লাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন, সুতরাং দুর্গের সকলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ জনার্দ্দনকে কণ্বমুনি ও তাঁহার পালিতা নিরুপমা লাবণ্যময়ী ক্ষত্রিয়বালাকে শকুন্তলা বলিয়া পরিহাস করিতেন। জনার্দ্দনও কন্যার সৌন্দর্য্য ও স্নেহে পরিতুষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্ব্বাসনের দুঃখও বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কতক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনার্দ্দন দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও এক্ষণও বলিষ্ঠ, চক্ষুর্দ্বয় শান্তিরসপূর্ণ ও শ্বেতশ্মশ্রু বিশাল বক্ষঃস্থল আবরণ করিয়াছে। জনার্দ্দনের বর্ণ গৌর, স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। পূজকের পবিত্র শান্তিপূর্ণ মন ও বালকের ন্যায় সরল হৃদয় জনার্দ্দনের মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনার্দ্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সংক্ষেপে মিষ্টালাপ করিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দ্দন শিবজীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ যতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলিলেন, ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া পূজকের হস্তে কয়েকটী সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন—

“প্রভুর প্রার্থনা যে তিনি এক্ষণে মোগলদিগের সহিত যে তুমুল রণে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাতে আপনি তাঁহার জয়ের জন্য ভবানীর নিকট পূজা করিবেন। দেবীপ্রসাদ ভিন্ন মনুষ্যচেষ্টা বৃথা।”

জনার্দ্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—“সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকালই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের

প্রহরীস্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও সে বিষয়ে ত্রুটি করিব না।”

রঘুনাথ। “প্রভুর দেবীপদে আর একটী আবেদন আছে। তিনি ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কথঞ্চিৎ পূর্ব্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন। ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এবিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।”

জনার্দ্দন ক্ষণেক চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় আপন গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

“রজনীযোগে দেবীপদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্য প্রাতে উত্তর জানিতে পারিবে।”

রঘুনাথ ধন্যবাদ করিয়া বিদায় হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময়ে জনার্দ্দন বলিলেন—

“তোমাকে পূর্ব্বে এই দুর্গে দেখি নাই, অদ্য কি প্রথমে এস্থলে আসিয়াছ?”

রঘু। “অদ্যই আসিয়াছি।”

জনা। “দুর্গে কাহারও সহিত পরিচয় আছে? থাকিবার স্থল আছে?”

রঘু। “পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্য প্রাতেই চলিয়া যাইব।”

জনা। “কিজন্য অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিবে?”

রঘু। “প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্লেশ হইবে না, আমাদের সর্ব্বদাই এরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়।”

যুবকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও সরল উদার আকৃতি দর্শনে জনার্দ্দনের অন্তঃকরণে বাৎসল্যের উদ্রেক হইল, বলিলেন—

“বৎস! যুদ্ধসময়ে ক্লেশ অনিবার্য্য, কিন্তু অদ্য ক্লেশ সহনের কোন আবশ্যকতা নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর, আমার পালিতা রাজপুতবালা তোমার খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিবে। পরে রাত্রে বিশ্রাম করিয়া কল্য দেবীর আজ্ঞা শিবজীর নিকট লইয়া যাইবে।”

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা স্ফীত হইল, তাঁহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে আঘাত করিল। এটী যাতনা না আনন্দের উদ্বেগ? রাজপুতবালা কে? সে কি সেই সায়ংকালীন আকাশপটে অঙ্কিত মনোহর চিত্র? রজনীর আগমনে আকাশপট হইতে সে চিত্র লীন হইয়াছে, কিন্তু রঘুনাথের হৃদয়পট হইতে সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি কখন—কখন—কখনই লীন হইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠমালা।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"
ভারতচন্দ্র রায়।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরযুবালা পিতার আদেশে অতিথির খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিলেন, রঘুনাথ আসন গ্রহণ করিলেন, সরযু পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাবধি আহূত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন এক জন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার রীতি আছে।

রঘুনাথ বসিলেন, কিন্তু ভোজন দূরে থাক, চিত্তসংযম করিতে পারিলেন না। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত আধারে সরযু মিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্রধারিণীর দিকে সোদ্বেগচিত্তে চাহিলেন, যেন তাঁহার জীবন, প্রাণ, দৃষ্টির সহিত হইয়া সেই কন্যার দিকে ধাবমান হইল! চারি চক্ষুর মিলন হইল, অমনি সরযুর মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, লজ্জাবতী চক্ষু মুদিত করিয়া মুখ অবনত করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। রঘুনাথও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অধোবদন হইলেন।

পুনরায় সরযু আর একটী পাত্র আনিলেন, রঘুনাথ বর্ব্বর নহেন, এবার তিনি মুখ অবনত করিয়া রাখিলেন, কেবল সরযুর সুন্দর সুবর্ণ বলয়-বিজড়িত হস্ত ও কঙ্কণ-বিজড়িত সুগোল বাহুমাত্র দেখিতে পাইলেন; অগত্যা হৃদয় স্ফীত হইল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। সরযু তাহা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার হস্ত ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, তিনি ধীরে ধীরে পার্শ্বে সরিয়া গেলেন।

ভোজন সাঙ্গ হইল। রঘুনাথের শয্যারচনা হইল, রঘুনাথ দীপ নির্ব্বাণ করিলেন, শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সেই গম্ভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অল্পবয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ সুপ্ত হইয়াছে, দুর্গে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিস্তব্ধ দুর্গে ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে

প্রতিহত হইতেছে। এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিদ্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

রঘুনাথের জীবনের এই প্রথম গভীর চিন্তা, এই হৃদয়ের প্রথম ভীষণ উদ্বেগ, এ চিন্তা এ উদ্বেগ রজনীর মধ্যে শেষ হইবার নহে, চিরজীবনে কি শেষ হইবে? এতদিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অদ্য যেন সহসা তাঁহার শান্ত, নীল, জীবনাকাশের উপর দিয়া বিদ্যুৎরূপিণী একটী প্রতিমূর্ত্তি সরিয়া গেল, রঘুনাথের নয়ন, হৃদয় ঝল্‌সিয়া গেল, তাঁহার সুপ্ত চিন্তা, উদ্বেগ ও সহস্র বেগবতী মনোবৃত্তি সহসা জাগরিত হইল। শত সহস্রবার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি মনে আসিতে লাগিল, সেই আলেখ্য-লিখিত ভ্রূযুগল, সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষু, সেই পুষ্পনিন্দিত মধুময় ওষ্ঠ দুইটী, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই সুগোল বাহুযুগল মনে জাগরিত হইতে লাগিল, আর রঘুনাথ উন্মত্ত হইয়া সেই চিত্রের দিকে দেখিতে লাগিলেন। এই আনন্দময়ী কন্যা কি তিনি লাভ করিতে পারিবেন? এই আয়ত স্নেহপূর্ণ নয়ন, এই জবানিন্দিত ওষ্ঠ, এই চিত্তহারী অতুল লাবণ্য, রঘুনাথ! কি তোমার হইবে? তুমি একজন সামান্য হাবিলদার মাত্র, জনার্দ্দন অতি উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত, তাঁহার পালিত কন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়া! কিজন্য এরূপ আশায় হৃদয় বৃথা ব্যথিত করিতেছ? রঘুনাথ! এ বৃথা তৃষ্ণায় কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ?

দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল, কিন্তু রঘুনাথের এ বিষম চিন্তা শেষ হইল না। হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া একাকী নিঃশব্দে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। এই শান্ত রজনীতে তাঁহার হৃদয়ে কি প্রলয়ের ঝটিকা বহিতেছে!

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ হয় না, অসাধ্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া, চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতেছিলেন, অনেকক্ষণ পর সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া সগর্ব্বে ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন—

" ভগবন্, সহায় হও, অবশ্য কৃতকার্য্য হইব; যশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্য-সাধ্য, কিজন্য আমার অসাধ্য হইবে? আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ? বাহু কি অন্য অপেক্ষা দুর্ব্বল? * * "দেখিব এই পণ রাখিতে পারি কি না।" * * "তাহার পর? যদি কৃতকার্য্য হই তাহা হইলে সরযূ! আমি তোমার অযোগ্য হইব না; তখন সরযূ! তোমাকে গন্ধচ্ছলে

অদ্যকার এই সকল কথা বলিব, তখন তোমার সুন্দর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া স্বর্গসুখ তুচ্ছ করিব, তখন স্বহস্তে ঐ সুন্দর কেশপাশে মুক্তামালা জড়াইয়া দিব, আর ঐ সুন্দর বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠদ্বয়———” রঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্মত্ত হইও না।

তখন রঘনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে শয়ন করিতে আসিলেন। গৃহের ভিতর না যাইয়া সেই ছাদের যেস্থানে পূর্ব্বদিন সরযু বসিয়াছিলেন সেই-স্থানে শয়ন করিতে আসিলেন। দেখিলেন—কি দেখিলেন? দেখিলেন একটী কণ্ঠমালা পড়িয়া রহিয়াছে; দুইটী করিয়া মুক্তা পরে একটী করিয়া পলা,—রঘুনাথ সে মালা চিনিলেন। সেই মালা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সরযু কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় অসাবধানতা বশতঃ ঐস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভগবন্ একি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দান করিলেন?” শত সহস্রবার সেই মালা চুম্বন করিয়া পরে পরিধেয় কুর্ত্তীর নীচে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে অচিরাৎ সেইস্থানেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্নপূর্ণ, স্বপ্ন সরযুপূর্ণ।

পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জনার্দ্দন দেবের নিকট ভবানীর আজ্ঞা জানিলেন; “ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়, স্বধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজয়।” পরে কিল্লাদারের নিকট কতকগুলি লিপি ও যুদ্ধ-বিষয়ক উপদেশ লইয়া রঘুনাথ যাত্রা করিলেন।

দুর্গ ত্যাগের পূর্ব্বে একবার সরযুর সহিত দেখা করিলেন; সরযু যখন মন্দিরে আসিয়াছেন, ধীরে ধীরে আপনিও তথায় যাইলেন; হৃদয়ের তুমুল উদ্বেগ কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলেন—

“ভদ্রে! কল্য নিশিযোগে ছাদে এই কণ্ঠমালাটী পাইয়াছি, সেইটী দিতে আসিয়াছি; অপরিচিতের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।”

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযু ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সেই কমনীয় উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল কৃষ্ণ নয়নদ্বয়, সেই তরুণ যোদ্ধার উন্নত অবয়ব! সহসা রমণীর শরীর কম্পিত হইল, গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল! সরযু উত্তর দিতে অশক্ত।

সরযুকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন, “যদি অনুমতি করেন তবে এই সুন্দর মালাটী উহার অভ্যস্তস্থানে স্থাপন করিয়া জীবন চরিতার্থ করি।”

সরযু সলজ্জনয়নে একবার রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, উঃ! সে বিশাল আয়ত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় সহস্রধা বিদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জায় আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

মৌনই সম্মতির লক্ষণ জানিয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, কন্যার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিলেন না।

কন্যার শরীর একেবারে রোমাঞ্চিত হইল, ও বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; ধন্যবাদ দিবেন কি তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠ হইতে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

রঘুনাথ সরযুর এই উদ্যম দেখিয়াই আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত বিবেচনা করিলেন। ক্ষণেক পর ঈষৎ খেদযুক্ত স্বরে বলিলেন—"তবে অতিথিকে বিদায় দিন।"

সরযু এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংযম করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চাহিলেন; আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "আপনার নিকট অনুগৃহীত রহিলাম, পুনরায় কি এ দুর্গে আগমন হইবে?"

উঃ! পিপাসার্ত্ত চাতকের পক্ষে প্রথম বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায়, পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে উষার প্রথম রক্তিমাচ্ছটার ন্যায়, সরযুর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃত কথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত করিল! তিনি উত্তর করিলেন—

"রমণীরত্ন! আমি পরের দাস, যুদ্ধ আমার ব্যবসা, পুনরায় কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না জানি না; কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিব, যতদিন এই হৃদয় শুষ্ক না হইবে, ততদিন আপনার সৌজন্য, আপনার যত্ন, আপনার দেবনিন্দিত মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইব না। আপনার পিতা এই পথে আসিতেছেন, আমি বিদায় হইলাম, কখন কখন নিরাশ্রয় দরিদ্র সেনাকে স্মরণ করিবেন।"

সরযু উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘুনাথ দেখিলেন সেই আয়ত নয়ন দুইটী ছল্ ছল্ করিতেছে; তাঁহার আপনার নয়নও শুষ্ক ছিল না।

অচিরে দেবালয় হইতে বাহির হইলেন ও অশ্বে আরূঢ় হইয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

রঘুনাথের অধীনের অশ্বারোহীগণ পূর্ব্বদিন রঘুনাথের অল্প পরে আসিয়াছিল, সুতরাং প্রাচীরের বাহিরে তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল। তাহারা পুনরায় আপনাদিগের অসমসাহসী ও দুর্দ্দমনীয় তেজস্বী হাবিল-

দারকে পাইয়া হুঙ্কার শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সরল বালককে আর পাইল না। তোরণদুর্গাগমনের দিন হইতে রঘুনাথজীর বাল্যোচিত চপলতা দূর হইল, মনুষ্যের চিন্তা ও প্রতিজ্ঞায় জীবন আচ্ছন্ন হইল।

সেই দিবসেই রঘুনাথজী হাবিলদার সিংহগড়ে উপস্থিত হইয়া শিবজীকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শায়েস্তাখাঁ।

"কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন?"
নবীনচন্দ্র সেন।

যদিও কয়েক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমতা ও রাজ্য ও দুর্গসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২. খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে বশীকরণ অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর শায়েস্তাখাঁ আমীর উল উমরা খেতাপ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হয়েন, ও শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। শায়েস্তাখাঁ সেই বৎসরেই পুনা ও চাকনদুর্গ ও অন্য কয়েক স্থান অধিকার করেন, ও পরবৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লী-সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনামা যশোবন্তসিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খ্রীঃ) বহুসৈন্য লইয়া শায়েস্তাখাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল ও শায়েস্তাখাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। শায়েস্তাখাঁ শিবজীর চতুরতা বিশেষরূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে অনুমতিপত্র বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। শিবজী নিকটবর্ত্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসায়ে অধিক পরিপক্ক হয়

নাই; দিল্লীর পুরাতন সেনার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে; সুতরাং শিবজী চতুরতা ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্য বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষযোগে একদিন সায়ংকালে মোগল সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া সভায় বসিয়াছেন, ও কিরূপে শিবজীকে জয় করিবেন তাহাই পরামর্শ করিতেছেন। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহেই এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে, ও জানালার ভিতর দিয়া সায়ংকালের শীতল বায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, আমির উল্ ওমরা স্বয়ং ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

"তাহাকে পাইলে জয় করিতে কতক্ষণ?" আনওরী নামে একজন চাটুকার বলিল, "আমিরের সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহা বাত্যার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে, অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতর প্রবেশ করিবে।"

সেনাপতি তুষ্ট হইয়া হাস্য করিলেন।

চাঁদখাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কয়েক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আমি বোধ করি তাহাদের উক্ত দুইটী ক্ষমতাই আছে।"

শায়েস্তাখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

চাঁদখাঁ নিবেদন করিলেন, "গত বৎসর কতিপয় পার্ব্বতীয় মহারাষ্ট্রীয় যখন চাকন দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা জঁহাপানার স্মরণ আছে; একটী দুর্গ হস্তগত করিতে সহস্র মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদনগর ও অরাঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইয়া দেশ ছারখার করিয়া আসিয়াছে।"

সভাসদ্ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, শায়েস্তাখাঁ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন—

"চাঁদখাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্ব্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন। পূর্ব্বে তাঁহার এরূপ ভয় ছিল না।" চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

আনওরী সময় বুঝিয়া বলিল, "জহাঁপানা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুরবিশেষ, তাহারা যে পর্ব্বত-ইন্দুরের ন্যায় গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে তাহা আমি অস্বীকার করি না।"

শায়েস্তাখাঁ এইটী বড় সুন্দর রহস্য বিবেচনা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, সুতরাং সভাসদ্ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল। চাটুকারেরই জয়।

চাঁদখাঁ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অস্পষ্টস্বরে বলিলেন—"ইন্দুরে পুনার ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা!" শায়েস্তাখাঁ এবিষয়ে উদ্বেগশূন্য ছিলেন না কিন্তু ভয়চিহ্ন সম্বরণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—"এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নখায়ুধ বিড়াল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবেন না।" সভাসদ্ সকলেই "কেরামৎ" "কেরামৎ" করিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি শায়েস্তাখাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "এই প্রদেশ দুর্গপরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয় তবে কত দিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, কখনও সিদ্ধি হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই।" চাঁদখাঁ কার্য্যজ্ঞ ছিলেন এইক্ষণেই অপ্রতিভ হইয়াছেন সে কথা বিস্মৃত হইয়া সৎপরামর্শ দিবার চেষ্টা করিলেন। "জহাঁপানা! দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল, উহারা সম্মুখ রণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই, কেননা দেশ পর্ব্বতময়, উহাদের সেনা এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্ দিক দিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।"

শায়েস্তাখাঁ চাকন দুর্গ অধিকার করিয়া অবধি আর দুর্গ জয় করিবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিলেন, "কেন? মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী নাই, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্র-সেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?"

চাঁদখাঁ পুনরায় নিবেদন করিলেন—"যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাষ্ট্রীয় সেনা বিনাশ করিব তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া

ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ, অশ্বারোহী বর্ম্মাবৃত ও বহু-অস্ত্র-সমন্বিত; সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ, তাহাদের ভার দুর্দ্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত; কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে তাহাদিগের যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ও অশ্বারোহীগণ যেন ছাগের ন্যায় তুঙ্গশৃঙ্গে লম্ফ দিয়া উঠে, ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও সুরাখের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জহাঁপানা! আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন; এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লীশ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? দেখুন, নিতাইজী অনায়াসে আমাদের নিকট দিয়া যাইয়া আহম্মদনগর ও আরঙ্গাবাদ ছারখার করিয়া আসিল, রুস্তম জমান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কি করিল?"

শায়েস্তাখাঁ সক্রোধে বলিলেন—"রুস্তম জমান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নাতাজীকে পলাইতে দিয়াছে; আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদখাঁ, তুমিও সম্মুখ যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীশ্বরের সেনাগণের মধ্যে সাহসী কি কেহই নাই?"

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একবিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন; পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই; সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেরূপ হুকুম হইবে, তামীল করিতে এ দাস পরাঙ্মুখ হইবে না।"

চাঁদখাঁ উৎকৃষ্ট পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করেন, শায়েস্তাখাঁর এরূপ সাহস ছিল না।

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। শায়েস্তাখাঁ তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আসিরার আজ্ঞা দিলেন। সভার সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

ক্ষণেক পরই মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রীর বয়স এক্ষণও চত্বারিংশৎ বৎসর হয় নাই; অবয়ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় ঈষৎ খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর,

বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীর বুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলক চন্দন, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর পুরু তুলার কুর্ত্তিতে আবৃত, সুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বদনমণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। শায়েস্তাখাঁ সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

শায়েস্তাখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, " সিংহগড়ের সংবাদ কি?"

মহাদেওজী একটী সংস্কৃত শ্লোক পড়িলেন—

" সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটীবনে।
সরযূ-বিচ্ছেদশোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ॥"

পরে তাহার অর্থ করিলেন, "দণ্ডকারণ্যে ও পঞ্চবটীবনে শত শত নদী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযূ নদীর বিচ্ছেদদুঃখ ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণও শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সন্তাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন?"

শায়েস্তাখাঁ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও প্রধান দুর্গ আমি হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এক্ষণও আশা আছে।"

ব্রাহ্মণ ঈষদ্ধাস্ত করিয়া পুনরায় সংস্কৃত পাঠ করিলেন —

" ন শক্তোহি স্বাভিলাষং জ্ঞাপয়তুঞ্চাতকঃ।
জ্ঞাত্বাতু তং বারিধরস্তোষয়তি যাচকং॥"

" অর্থাৎ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ আপনার দয়া বশতই সেই অভিলাষ বুঝিয়া পূর্ণ করে। মহজ্জনের যাচককে দিবার এই রীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধিপ্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহল্লোক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া যাহা দান করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য।"

শায়েস্তাখাঁ আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "পণ্ডিতজী, তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরিতুষ্ট হইলাম বলিতে পারি না; তোমাদের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাবপরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন?"

মহাদেওজী। "খাঁ সাহেব! সম্মুখযুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সৈন্যের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল 'সন্ধি সন্ধি' এই শব্দ করিতেছি।"

শায়েস্তাখাঁ এবার আহ্লাদ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "চাঁদখাঁ! সম্মুখযুদ্ধ ভাল না দুর্গ অবরোধ ভাল, কিসের দ্বারা শত্রু অধিক ভীত হইয়াছে?" পরে আনন্দ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া শায়েস্তাখাঁ বলিলেন—

"ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রালোচনায় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন কৈ?"

ব্রাহ্মণ তখন গম্ভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শায়েস্তাখাঁ সেইটী দেখিলেন। পরে বলিলেন—"হাঁ আমি নিদর্শন পত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে করুন।"

মহাদেওজী। "প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে যখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা।"

শায়েস্তাখাঁ। "ভাল।"

মহা। "সুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন।"

শায়ে। "ভাল।"

মহা। "এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক। জানিলে সেইগুলি পালন করিতে যত্নবান হইবেন।"

শায়ে। "প্রথম দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকারকরণ। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন?"

মহা। "তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই; মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেইগুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।"

শায়ে। "ভাল, প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকারকরণ। দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কয়েকটী দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।"

মহা। "সে কোন্ কোন্টী?"

শায়ে। "তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্রদ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়গীরস্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি অসম্মত তাহা যেন আমি দুই এক দিনের মধ্যে জানিতে পারি।"

মহা। "যেরূপ আদেশ করিলেন সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে তখন যতদিন সন্ধিস্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?"

শায়ে। "কদাচ নহে। ধূর্ত্ত কপটাচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না; এমত ধূর্ত্ততা নাই যে তাহাদের অসাধ্য। যতদিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার, আমাদের অনিষ্ট করিও।"

"এবমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দূত মহাশয়, কি দেখিতেছেন?" দূত উত্তর করিলেন, "এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি; এটীও তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয় একে একে সমস্ত দুর্গগুলিই তোমরা লইবে; হা! ভগবন্!" প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল, "সেজন্য আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্য্যে যাও।" "সে কথা সত্য" বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহুজনাকীর্ণ পুনানগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য্যের দিনস্থির।

"অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ।"
নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতিবাহন করিলেন; যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই একটী দোকানে দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন, প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটী গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে সুপ্ত।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন, আকাশ অন্ধকারময়, কেবল দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ। ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন,—কৈ সে পদশব্দ আর শুনা যায় না।

পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পর পুনরায় বোধ হইল যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে? সে শত্রু না মিত্র? শত্রু হইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? উদ্বেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; পরে নিঃশব্দে তুলা-নির্ম্মিত কুর্ত্তির আস্তিনের ভিতর হইতে একটী তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটী পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন; গভীর অন্ধকারের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, কৈ কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ!

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারে ফিরিয়া গেলেন; তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় অনেক লোক এখনও ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে দ্রুতবেগে

অন্যান্য গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটীর, অট্টালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারদ্বারা সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছে। অনেকক্ষণ পর একটী চীৎকারশব্দ শ্রুত হইল; ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী পাহারা দিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুক্কায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সঙ্কীর্ণ, মহাদেও পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে সেইস্থানে আসিল, এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে সেই স্থানে আসিল; মহাদেও যেস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেইদিকে চাহিল। উঃ! মহাদেবের হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না; ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন।

পরে নিকটবর্ত্তী একটী দ্বারে আঘাত করিলেন; শায়েস্তাখাঁর একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনা বাহির হইয়া আসিল; দুইজনে অতি সঙ্গোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দুইজনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সমস্ত প্রস্তুত?"

সেনা। "প্রস্তুত।"

ব্রাহ্মণ। "অনুমতিপত্র পাইয়াছ?"

সেনা। "পাইয়াছি।"

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ছুরিকাহস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন; অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না। ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে সেনাকে বলিলেন, "রিক্তহস্তে আসিয়াছ?"

সেনা বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিল, "ভাল, সতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে?"

সেনা। "কল্য।"

ব্রাহ্মণ। "অনুমতি পাইয়াছ?"

সেনা। "হাঁ" একটী কাগজ দেখাইল।

ব্রাহ্মণ। "কতজন লোকের?"

সেনা। "বাদ্যকর দশ জন ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন, ইহার অধিক অনুমতি পাইলাম না।"

ব্রাহ্মণ। "এই যথেষ্ট, কোন্ সময়ে?"

সেনা। "রজনী এক প্রহর।"

ব্রাহ্মণ। "ভাল, এই দিক্ হইতে বরযাত্রা আরম্ভ হইবে।"

সেনা। "স্মরণ আছে।"

ব্রাহ্মণ। "বাদ্যকারেরা সজোরে বাদ্য করিবে।"

সেনা। "স্মরণ আছে।"

ব্রাহ্মণ। "জ্ঞাতি কুটুম্ব যত পারিবে জড় করিবে।"

সেনা। "স্মরণ আছে।"

ব্রাহ্মণ তখন অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমরাও শুভকার্য্যে যোগ দিব, সে শুভকার্য্যের ঘটা সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে।"

সহসা একটী সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল; সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুর্ত্তির নীচে লৌহ-বর্ম্মে লাগিয়া তীর খণ্ড খণ্ড হইল।

তৎপরেই একটী বর্শা। বর্শার ভীষণ আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, নিষ্কোষিত অসিহস্তে একজন দীর্ঘ মোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদখাঁ।

অদ্য সভাতে সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ চাঁদখাঁকে ভীরু বলিয়াছেন। যুদ্ধব্যবসায়ে চাঁদখাঁর কেশ শুক্ল হইয়াছিল, সম্মুখ যুদ্ধ বিনা তিনি কখনও পলায়ন জানিতেন না, এ অপবাদ কখন কেহ তাঁহাকে দেয় নাই।

মনে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, মনে স্থির করিলেন কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ দান করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক দুর্গ, তাঁহার অপূর্ব্ব ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্য স্থাপনে অভিলাষ, হিন্দু-স্বাধীনতাসাধনে প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত

চাঁদখাঁর নিকট অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধপ্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি যাচ্ঞা করিবেন এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শন পত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুপ্ত অভিসন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদখাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রের নিন্দা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জলিত হয় তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সন্দেহের কথা শায়েস্তাখাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ্য করিবেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন এই ভণ্ড দূতকে ধরিব। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলিতে গলিতে অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রাহ্মণ চাঁদখাঁর নয়নবহির্ভূত হইতে পারেন নাই।

সেনার সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয় তাহা শুনিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ করিয়া সেনাকে সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তি লাভের সঙ্কল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "শায়েস্তাখাঁ! যুদ্ধব্যবসায়ে বৃথা এ কেশ শুক্ল করি নাই, আমি ভীরুও নহি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারীও নহি; অদ্য যে ষড়যন্ত্রটী ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব তাহার পর বোধ হয় এ প্রাচীন দাসের কথা অবহেলা করিবে না।" কিন্তু আশা মায়াবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদখাঁ তীর ও বর্শা ব্যর্থ দেখিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খড়্গ দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। আশ্চর্য্য বর্ম্মে লাগিয়া সে খড়্গ প্রতিহত হইল।

"কুক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে" বলিয়া মহাদেওজী আপন আস্তিন গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন।

নিমেষমধ্যে বজ্রমুষ্টি চাঁদখার বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল,—চাঁদখাঁর মৃতদেহ ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন—

"শায়েস্তাখা! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে দ্বিতীয় ফল কল্য ফলিবে।"

শায়েস্তাখাঁ! অন্যায় তিরস্কারে অদ্য যে অমূল্য বীররত্নটীকে হারাইলে, বিপদের সময় তাহাকে স্মরণ করিবে কিন্তু আর পাইবে না!

যোদ্ধার কর্ত্তব্যকার্য্যে যে সময়ে চাঁদখাঁ জীবনদান করিলেন, সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ সে সময়ে বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, শিবজীকে বশীকরণবিষয়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন!

মহারাষ্ট্রীয় সেনা এই সমস্ত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রভু কি করিলেন? কল্য এবিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদয় সঙ্কল্প বৃথা হইবে।"

ব্রাহ্মণ। "কিছুমাত্র বৃথা হইবে না। আমি জানিয়াছি চাঁদখাঁ অদ্য সভায় অপমানিত হইয়াছেন, এখন কয়েকদিন সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে না! এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, আর স্মরণ রাখিও কল্য রজনী এক প্রহরকালে।"—

সেনা। "রজনী এক প্রহরকালে।"

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ করিলেন। তিন চারি স্থানে প্রহরীগণ তাঁহাকে ধরিল, তিনি শায়েস্তাখাঁর স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র দেখাইলেন, ও নিরাপদে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজা যশোবন্তসিংহ।

"কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা।"
মধুসূদন দত্ত।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত রাজা যশোবন্তসিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া এই গভীর নিশীথেও কি চিন্তা করিতেছেন, সম্মুখে কেবল একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে, শিবিরে অন্য লোকমাত্র নাই।

সংবাদ আসিল-মহারাষ্ট্রীয় দূত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। যশোবন্ত তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবিরে আসিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন। মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুতের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছিলেন।

পরে যশোবন্ত বলিলেন, "আমি আপনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি। তাহাতে যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে?"

মহা। "প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে পাঠাইয়াছেন।"

যশো। "কেবল পুনা ও চাকান দুর্গ আমাদের হস্তগত হইয়াছে মাত্র, এই জন্য খেদ?"

মহা। "দুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহার অসংখ্য দুর্গ আছে।"

যশো। "মোগল-যুদ্ধস্বরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন?"

মহা। "বিপদে পড়িলে খেদ করা তাঁর অভ্যাস নাই।"

যশো। "তবে কি জন্য খেদ করিতেছেন?"

মহা। "যিনি হিন্দুরাজ-তিলক, যিনি ক্ষত্রিয়কুলাবতংস, যিনি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাকে অদ্য ম্লেচ্ছের দাস দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।"

যশোবন্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল; মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন;—

"উদয়পুরের প্রতাপ রাণার বংশে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাড়ওয়ারের রাজছত্র যাঁহার মস্তকের উপর ধৃত হইয়াছে, রাজস্থান যাঁহার সুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে যাঁহার বাহুবিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহাকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মন্দিরে মন্দিরে যাঁহার জয়ের জন্য হিন্দুমাত্রেই, ব্রাহ্মণমাত্রেই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, অদ্য তাঁহাকে মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজন্! আমি সামান্য দূতমাত্র, আমি কি বলিতেছি জানি না, অপরাধ হইলে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসজ্জা কেন? এ সৈন্যসামন্ত কেন? এ সমস্ত বিজয়পতাকা কিজন্য উড্ডীন হইতেছে? স্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য? হিন্দু-স্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য? ক্ষত্রোচিত যশোলাভের জন্য? আপনি ক্ষত্রকুলর্ষভ! আপনি বিবেচনা করুন; আমি জানি না।"

যশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন—

"আপনি রাজপুত। মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত-পুত্র; পিতাপুত্রে যুদ্ধ সম্ভবে না; স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করুন আমরা পালন করিব। রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব। রাজপুতের যশোগীত আমাদের রমণীগণ এখনও গাইয়া থাকে, রাজপুতদিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত হয়, সে রাজপুতের সহিত যুদ্ধ। ক্ষত্রকুলতিলক! রাজপুত-শোণিতে আমাদিগের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা যেন বর্শা ও খড়্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ধারণ করিতে শিখি!"

যশোবন্তসিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দূতপ্রধান! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দিল্লীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব——"

"এবং শত শত স্বধর্ম্মীকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে ক্ষত্রিয়-শোণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে ম্লেচ্ছ সম্রাটের সম্পূর্ণ জয় হইবে।" ঈষৎ ব্যঙ্গভাবে দূত এই কথা বলিলেন।

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উদ্বেগ সম্বরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কর্কশভাবে বলিলেন—

"কেবল দিল্লীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে;—আমি তোমার প্রভুর সহিত কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিদ্রোহাচারী, চতুর শিবজী অদ্যের অঙ্গীকার অনায়াসে কল্য ভঙ্গ করে।"

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জলিত হইল, তিনি ধীরে বলিলেন, "মহারাজ! সাবধান, অলীক নিন্দা আপনার সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য দান করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিয়াছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? দেশে শত শত গ্রাম শত শত দেবালয় আছে অনুসন্ধান করুন, শিবজী সত্য পালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, হিন্দুদেবের পূজা দিতে কবে পরাঙ্মুখ? তবে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ! জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা? বজ্রনখ যখন সর্পকে ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে, মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র জর্জ্জরিত-শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে, এটী বিদ্রোহাচরণ নয়; এটী স্বভাবের রীতি। কুক্কুর যখন খরগশকে

ধরিবার চেষ্টা করে, খরগশ প্রাণরক্ষার জন্য কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্যদিকে যায়; এটী চাতুরী না স্বভাবের রীতি? দেখুন, যাবতীয় জীবজন্তুদিগকে জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার যত্ন ও উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি সে উপায় শিখান নাই? আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি শোষণ করিতেছে, হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ বল, মান, দেশগৌরব, জাত্যভিমান শোষণ করিতেছে, ধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি স্বধর্ম্ম ও জাতিগৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীয়? জীবনরক্ষার্থ পলায়নপটু মৃগের শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে অন্যদিকে লইয়া যাইতে যত্ন করে, সেটী কি নিন্দনীয়? ক্ষত্রিয়রাজ! দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুসলমানদিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দুপ্রবর! আপনি হিন্দুজীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না।" মহাদেবের জ্বলন্ত নয়নদ্বয় জলে আবৃত হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। বলিলেন, "দূতপ্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি নাই, যদি অন্যায় বলিয়া থাকি মার্জ্জনা করিবেন। আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছিলাম যে, দেখুন্ রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহারা সাহস ও সম্মুখরণ ভিন্ন অন্য উপায় জানে না। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না?"

মহা। "মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্ব্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ব্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইহার কোন্টী আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণ-শিক্ষা। আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনারা পুরাতন রীত্যনুসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্দ্ধর্ষ তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য রাজপুত সেনার সম্মুখে দিল্লীশ্বরের সেনা সরিয়া যায়। আমাদের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? পূর্ব্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, যাহারা আছে তাহারা প্রত্যুত রণ দেখে নাই। যখন দিল্লীশ্বর

কাবুল, পঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থানভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ বৃহৎ ও অনিবার্য্য রণ-অশ্ব ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সেনা নাই, সেরূপ অশ্ব গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই, চতুরতা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? ত্বরিতগতি ও পর্ব্বতযুদ্ধ ভিন্ন তাহাদের আর কি উপায় আছে? ক্ষত্রিয়রাজ! জীবনপ্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন মহারাষ্ট্রীয় জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সংস্থান হইলে, দুই তিনশত বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।”

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে ললাট স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন তাঁহার বাক্যগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

“আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসাধনে সন্দেহ করিতেছেন কেন? হিন্দুধর্ম্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীরও ইহা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই। মুসলমান শাসন ধ্বংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরবসাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষাকরণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন তবে স্বহস্তে এই কার্য্য সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদ্ঘাটিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণ বলবান, সহস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপযুক্ত, শিবজী সন্তুষ্টচিত্তে আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংস সাধন করিবেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।”

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবন্তের নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, “মাড়ওয়ার ও মহারাষ্ট্র অনেক দূর, এক রাজার অধীন থাকিতে পারে না।”

মহাদেও। "তবে আপনার উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকেই এই রাজ্য দিন, নচেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শিবজী ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে কার্য্য করিবে, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না।"

যশোবন্ত আবার চিন্তা করিয়া বলিলেন—"এই বিপদ্‌কালে আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এ দেশ রাখিতে পারিবে এমত আত্মীয় নাই।"

মহাদেও। "কোন ক্ষত্রিয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করুন, হিন্দুধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।"

যশোবন্ত। "সেরূপ সেনাপতিও নাই।"

মহাদেও। "তবে যিনি এই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের গৌরবসাধন করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রযোদ্ধাকে সহায়তা করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনাকে এজন্য প্রশংসাবাদ না করিবেন।"

যশোবন্ত ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দ্বিজবর, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীশ্বর আমাকে স্নেহ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি ভদ্রোচিত?"

মহা। "দিল্লীশ্বর যে হিন্দুদিগের কাফের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, সে কার্য্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দুপূজক, হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবালয়ের অবমাননা করিতেছেন, সে কি ভদ্রোচিত? কাশীর পুরাতন মন্দির চূর্ণ করিয়া সেই প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভদ্রোচিত?"

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন—"দ্বিজবর! দ্বিজবর! আর বলিবেন না, যথেষ্ট বলিয়াছেন! অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র। রাজপুতের প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হয় না, অদ্যাবধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজ[illegible] চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে এতদিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।"

মহারাষ্ট্রীয় দূত ঈষৎ হাস্য করিয়া যশোবন্তের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া যাইয়া একটী কথা কহিলেন। শুনিবামাত্র যশোবন্ত একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন, চকিতের ন্যায় ক্ষণেক নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, বিস্ময়োৎ-

ফুল্ললোচনে দূতের দিকে দেখিতে লাগিলেন, পরে সানন্দে ও সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে গোপনে অতি মৃদুস্বরে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর মহাদেও বলিলেন, "মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কল্য কোন ছলে পুনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।"

যশো। "কেন? কল্য পুনা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?"

দূত হাস্য করিয়া বলিল, "না, একটী বিবাহকার্য্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।"

যশোবন্ত বুঝিয়া বলিলেন, "ভাল দূরেই থাকিব।" দূত বিদায় যাজ্ঞা করিলেন। যশোবন্ত ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

"ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের বোধ হয় অনেক দিন পাঠ সমাপন হইয়া থাকিবে; এক্ষণে স্মরণ আছে কি না।"

মহা। "তথাপি যে বিদ্যা আছে তাহাতে দিল্লীর সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ বিস্মিত হইয়াছেন।"

যশোবন্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময় বলিলেন, "তবে যুদ্ধবিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্য্য করিবেন।"

মহা। "সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব।"

যশো। "হাঁ বিস্মরণ হইয়াছিলাম, সেইরূপ কার্য্য করিতে তোমার প্রভুকে বলিও।" হাসিতে হাসিতে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

যশোবন্তের একজন বিশ্বস্ত অমাত্য অল্পক্ষণ পরে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শিবির হইতে এইমাত্র এক জন অশ্বারোহী সিংহগড়প্রমুখে যাইলেন, উনি কে?"

যশোবন্ত উত্তর করিলেন, "উনি হিন্দুজাতির আশাস্বরূপ, হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিবজী।

"অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর ?
অসুর পদাঙ্করজঃ ; শোভিত মস্তকে ?
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমরবীর্য্য সমরের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হবে নিঃশেষ।"
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড় প্রবেশ করিলেন। উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, উষ্ণীষ ও তুলার কুর্ত্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ম্ম ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে "ভবানী" নামক প্রসিদ্ধ খড়্গ। হস্তদ্বয় দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর ঈষৎ খর্ব্ব বটে, কিন্তু সুবদ্ধ; সুদৃঢ়বন্ধনী ও পেশীগুলি বর্ম্মের নীচে হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পেশওয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল পিঙ্গলী সানন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

"ভবানীর জয় হউক!" আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন।"

শিব। "আপনার আশীর্ব্বাদে কোন্ বিপদ্ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি ?"

মুর। "সমস্ত স্থির হইয়াছে ?"

শিব। "সমস্ত।"

মুর। "অদ্য রাত্রি বিবাহ ?"

শিব। "অদ্যই।"

মুর। "শায়েস্তাখাঁ কিছু জানেন না ? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদখাঁ কিছু জানেন না ?"

শিব। "শায়েস্তাখাঁ ভীত শিবজীর নিকট সন্ধিপ্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন; যোদ্ধা চাঁদখাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, আর যুদ্ধ করিবেন না।" শিবজী সবিশেষ বিবরণ বলিলেন।

মুর। "যশোবন্ত?"

শিব। "আপনি পত্রে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল; আমি যাইয়াই দেখিলাম তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল।"

মুর। "ভবানীর জয় হউক! উঃ! আপনি এক রাত্রিতে একাকী যে কার্য্যসাধন করিলেন তাহা সহস্রের অসাধ্য। যে অসমসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভাবিলে এক্ষণও হৃৎকম্প হয়। শিবজী! শিবজী! এরূপ কার্য্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি থাকিবে?"

শিবজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মুরেশ্বর! বিপদ্ ভয় করিলে অদ্যাবধি জায়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদ্ ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন যেন মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হয়।"

মুর। "বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার জয় অনিবার্য্য, স্বয়ং ভবানী সহায়তা করিবেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে, একাকী ছদ্মবেশে? অঙ্গীকার করুন এরূপ আচরণ করিবেন না, আপনার কি বিশ্বস্ত অনুচর নাই?"

শিবজী দেখিলেন বিশ্বস্ত পেশওয়ার নয়নে একবিন্দু জল। হাস্য করিয়া বলিলেন—"অদ্য সত্যই একটী মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।"

মুর। "কি?"

শিব। "এমন মুর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন? যে আপন নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে সংস্কৃত স্মরণ রাখিবে?"

মুর। "কেন, কি হইয়াছিল?"

শিব। "আর কিছু নহে, শায়েস্তাখাঁর সভায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।"

মুর। "তাহার পর?"

শিব। "দুই একটী মনে ছিল। তদ্দারাই কার্য্যসিদ্ধ হইল।" সহাস্যবদনে শিবজী শয়নাগারে গেলেন।

শিবজীর সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়; এইস্থলে তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই; ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এইটী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতার নাম শাহজী ও পিতামহের নাম মল্লজী-ভনস্লে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে ফুল্‌তন দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর বংশের কথা বলিয়াছি; সেই বংশের যোগপাল রাও মায়েকের ভগ্নী দীপাবাইকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেক দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ার আহম্মদনগরনিবাসী শাহশরীফ নামক একজন মুসলমান পীরের নিকট মল্লজী অনেক অনুরোধ করেন, এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারই কিছু পরে দীপাবাইয়ের গর্ভে একটী সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।

আহম্মদনগরের প্রসিদ্ধনামা লক্ষজী যাদব রাওয়ের নাম প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ হইয়াছে। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে হুলির দিনে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া যাদব রাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, যাদব রাওয়ের কন্যা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, সুতরাং বালক বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যাদবরাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, “কেমন, তুই এই বালকটীকে বিবাহ করিবি?” পরে অন্যান্য লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “দুইজনে কি সুন্দর জোড় মিলিয়াছে!” এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “বন্ধুগণ, সাক্ষী থাকিও, যাদব রাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অদ্য প্রতিশ্রুত হইলেন।” সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন যাদব রাও উচ্চবংশজ, শাহজীর সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে কখনই বাসনা করেন নাই; কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পরদিন যাদব রাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী যাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, সুতরাং মল্লজী আসিলেন না। যাদবরাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশমর্য্যাদার অভিমানিনী, কথিত আছে যে যাদব রাও রহস্য করিয়াও আপন দুহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বিলক্ষণ দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। মল্লজী সরোষে একটী গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে

বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছিলেন, “মল্লজী! তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শম্ভুর ন্যায় গুণান্বিত হইবেন, মহারাষ্ট্রদেশে ন্যায়বিচার পুনঃস্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্রুদিগকে দূরীভুত করিবেন। তাঁহার সময় হইতে কাল গণনা হইবে ও তাঁহার সন্তানসন্ততি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।”

সে যাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার শ্যালক যোগপালও তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের সুল্‌তানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হইলেন ‘রাজা ভন্‌শ্লে’ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন, সুবর্ণা ও চাকান দুর্গ ও তৎপার্শ্বস্থ দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন, ও জাগীরস্বরূপ পুনা ও সোপানগর পাইলেন। তখন আর যাদব রাওয়ের কোন আপত্তি রহিল না; ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে মহাসমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল ও আহম্মদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবরশাহ আহম্মদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, আকবরের পর জহাঁগীর ও তৎপর শাহজিহান আহম্মদনগর জয়ের জন্য প্রয়াস পান ও শেষোক্ত সম্রাটের সময় ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে এই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর অধীনে আইসে ও যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধকালে শাহজী সুষুপ্ত ছিলেন না। ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে (জহাঁগীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অম্বরের অধীনে ছিলেন ও একটী মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই, সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। নয় বৎসর পর তিনি দিল্লীশ্বর শাহজহাঁর পক্ষাবলম্বন করিলে উক্ত সম্রাট্ তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিলেন ও অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সম্রাট্‌দিগের অনুগ্রহ আজ আছে কাল থাকে না; তিন বৎসর পর শাহজীর কতকগুলি জায়গীর সম্রাট্ কাড়িয়া লইয়া ফতেহখাঁকে দান করেন, তাহাতে শাহজী বিরক্ত হইয়া সম্রাটের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে বিজয়পুরের সুল্‌তানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও আপন মৃত্যু পর্য্যন্ত

অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে কখনও বিজয়পুরের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

পতনোন্মুখ আহম্মদনগর রাজ্য নিজ অসাধারণ বাহুবলে দিল্লীর অধীন রাখিবার জন্য শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শত্রুহস্তে পতিত হইলে, শাহজী সেই বংশজ আর একজনকে সুল্‌তান বলিয়া সিংহাসনে আরোপিত করিলেন কতকগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশ শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহুসংখ্যক্ দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুল্‌তানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার প্রভু বিজয়পুরের সুল্‌তানকে এককালে দমন করিবার জন্য অষ্টচত্বারিংশৎ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক্ পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুল্‌তান বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল; আহম্মদনগর রাজ্য বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭) ও শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন। সুল্‌তানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন, সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পুনার নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণে কর্ণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাই দ্বারা শাহজীর শম্ভুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে জীজীর পিতা লক্ষজী যাদব রাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ এরূপ জনশ্রুতি আছে। এ কথা যদি যথার্থ হয় তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভূত সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খ্রীঃ অব্দে শাহজী টুকাবাইনাম্নী আর একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; অভিমানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পুত্র শিবজীকে লইয়া পুনার জায়গীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন; শাহজী টুকাবাইকে লইয়া কর্ণাটেই থাকিতেন ও তাহার গর্ভে বেনকাজী নামে একটী পুত্র হইল।

শাহজীর দুইজন অতি বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী ছিলেন। দাদাজী কানাইদেব পুনায় জায়গীর রক্ষা করিতেন এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; ও নারায়ণপন্ত নামে অন্য কর্ম্মচারী কর্ণাটের জায়গীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে সুবর্ণীদুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পুনা হইতে অনুমান ২৫ ক্রোশ উত্তরে ও জুনীর নামে খ্যাত। শিবজীর তিন বৎসর

বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত বিচ্ছেদ জন্মিল। শাহজী কর্ণাটাভিমুখে যাইলেন, জীজী সপুত্রে পুনায় আসিয়া দাদাজী কানাইদেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন।

শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন; আমরা ইতিপূর্ব্বে সেই গৃহে শায়েস্তাখাঁকে দেখিয়াছি।

মাতাপুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বাল্যকালাবধি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই; কিন্তু অল্পবয়সেই ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার, বর্শা নিক্ষেপ, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়্গ ও ছুরিকা চালন ও অশ্বারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়মাত্রেই অশ্বচালনায় তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন। এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলবান হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায়ই শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না, যখন অবসর পাইতেন, দাদাজীর চরণোপান্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক হইল, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইল, সেই পূর্ব্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল; ধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। অচিরাৎ শাস্ত্রানুযায়িক সমুদায় ক্রিয়াকর্ম্ম শিখিলেন, এবং কথা শুনিতে এরূপ আগ্রহ জন্মিল যে, অনেক বৎসর পর যখন দেশে খ্যাতি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে বহু বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে দাদাজীর যত্নে শিবজী অল্পকালমধ্যেই স্বধর্ম্মানুরক্ত ও অতিশয় মুসলমানবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন, ও ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার হইবার জন্য নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন। আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে ও দস্যুগণকেও চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন, ও পর্ব্বতপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। সেই পর্ব্বত কিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত। কখন কখন কয়েকদিন ক্রমাগত এই পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে যাপন করিতেন, কোন দুর্গ, কোন পথ, কোন উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল

না। শেষে কিরূপে দুই একটী দুর্গ হস্তগত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধবাক্য দ্বারা বালককে সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া জায়গীর যাহাতে সুচারুরূপে রক্ষা হয়, তাহাই শিখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে উন্নত পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, ও তাঁহার যৌবনসুহৃদ্গণের মধ্যে যশজী-কঙ্ক, তন্নজীমালশ্রী ও বাজী-ফাসলকর নামক তিনজন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইহাঁদের সহায়তায় ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণদুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্ত্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণদুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে; এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়ঃক্রম উনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎসর তোরণদুর্গের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটী তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন ও তাহার রাজগড় নাম দিলেন।

বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন ও এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শাহজী এসমস্ত বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ আচরণে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভব তাহা অনেক বুঝাইলেন, ও বিজয়পুরের অধীনে কার্য্য করিয়া শিবজীর পিতা কিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান পাইয়াছেন, তাহাও দেখাইলেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্ট বাক্যদ্বারা উত্তরদান করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছুদিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভৎর্সনা করিবেন এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি শিবজীকে সস্নেহভাবে

বলিলেন, "বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়কলুষিতকারী-দিগকে শাস্তিপ্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।" বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, শিবজীর হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর।

সেই বৎসরেই চাকন ও কন্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, ও কান্দানার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া সিংহগড় নাম রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকাবাইয়ের ভ্রাতা বাজী মহিতী সোপা দুর্গের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনীসময়ে আপন মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরেই পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভাইয়ের সহায়তা করিবার ছলনায় আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই অভদ্র আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা-স্বরূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর বাক্‌পটুতার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; তাঁহার কথা শুনিয়া ও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহাদের নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবজীর কর্ম্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় করিলেন, তখন বিজয়পুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন ও তাঁহাকে এক প্রস্তরময় ঘরে রাখিয়া আদেশ করিলেন যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই গৃহের দ্বার প্রস্তরদ্বারা একেবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসরকাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দীস্বরূপ রহিলেন।

জোলীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও যখন একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন শিবজী নিজ লোকদ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সহসা রাত্রিযোগে আক্রমণ করিয়া সেই দুর্গ হস্তগত করেন। শিবজী আপন উদ্দেশ্যসাধনার্থ অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ গর্হিত কার্য্য আর একটী করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সমস্ত জোলীপ্রদেশ অধিকার করিলেন ও সেই বৎসরেই (১৬৫৬) প্রতাপগড় নামক একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন, ও আপন প্রধান মন্ত্রী সম্রাজপন্তকে পেশওয়া খেতাব দিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে সম্রাজ কঙ্কণদেশে ফতেখাঁর নিকট পরাস্ত হওয়ায় শিবজী তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া পদচ্যুত করিলেন ও মুরেশ্বর ত্রিমুল পিঙ্গলীকে পেশওয়া করেন। মুরেশ্বরের সহিত পাঠক পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছেন। সমগ্র কঙ্কণদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক্ সৈন্য জড় হইল।

এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। আবুল ফাজেল নামক একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক্ কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। গর্ব্বিতভাবে প্রকাশ করিলেন যে, শীঘ্রই সেই অকিঞ্চিৎকর বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া সুলতানের পায়তখতের নিকট উপস্থিত করিবেন। (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ।)

এ সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথনামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী-সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে সাক্ষাৎ হইল ও নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল; রজনী যাপনার্থ গোপীনাথের জন্য একটী স্থান নির্দ্দেশ করা হইল।

রজনীযোগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাক্‌পটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি যাহাই করিয়াছি সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্ম্মের জন্য করিয়াছি; স্বয়ং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দুদেব ও দেবালয়ের উচ্ছিষ্টকারিদিগের দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্ম্মের শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে

আদেশ করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন, ও আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করুন।" এইরূপ উত্তেজনাবাক্যের পর শিবজী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জয়লাভ হইলে তিনি গোপীনাথকে হেওরা গ্রাম অর্পণ করিবেন, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সেই গ্রাম তাঁহাদেরই থাকিবে। গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে স্বীকার করিলেন; পরামর্শ স্থির হইল যে কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নিকটই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজেলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত শিবিকারোহণে নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজী সেইদিন বহু যত্নে প্রাতে স্নান পূজাদি সমাপন কবিলেন; স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাজ্ঞা করিলেন; তুলার কুর্ত্তি ও উষ্ণীষের নীচে লৌহবর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন; দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, বাল্যসহচর তন্নজীমালশ্রীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজেলের নিকট আসিলেন,—আলিঙ্গনচ্ছলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভূতলশায়ী করিলেন। শিবজীর উদ্দেশ্য সাধন হইল, কিন্তু এই গর্হিত কার্য্যে তাঁহার যশোরাশি চিরকাল কলুষিত থাকিবে। তৎক্ষণাৎ শিবজীর গুপ্তসেনা আবুল ফাজেলের সেনাকে পরাস্ত করিল, অন্নজীদত্ত নামক শিবজীর প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী পানাল্লা ও পবনগড় হস্তগত করিলেন, শিবজী বসন্তগড়, বন্ধন ও বিশালগড় হস্তগত করিলেন, ও বিজয়পুরের অন্য সেনাপতি রস্তম জমানকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে শাহজী মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন, শিবজী পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন, ও পিতা বসিতে আদেশ করিলেও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না। কয়েকদিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন, ও সন্ধিসংস্থাপন করিয়া দিলেন।

শিবজী পিতাকর্ত্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। শাহজীর জীবদ্দশায় শিবজীর সহিত বিজয়পুরের আর যুদ্ধ হয় নাই, তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয়, সে সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি স্থাপন হয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বৎসরই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, ও তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সেনা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য্য সম্পাদন।

"যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর,
জ্বলুক গগন ব্যাপি অনন্ত বহ্নিতে।
জ্বলুক সে দেবতেজ স্বর্গ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্র পরম্পরা দগ্ধ চির শোকানলে।"
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্যগণ নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে; এত নিঃশব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকও দুর্গের ভিতর কি হইতেছে তাহা জানিতে পারে নাই।

দুর্গের একটী উন্নত স্থানে কয়েকজন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সেই দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর! দুর্গতলে, পূর্ব্বদিকে সুন্দর নীরানদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্তকালের নব পুষ্পপত্র ও দূর্ব্বাদলে সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপধারণ করিয়াছে। উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্য্যন্ত সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনানগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধাগণ প্রায়ই সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অদ্য রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম ঘঠনা সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। কেহ কেহ বা দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে দেখিতেছিলেন, উন্নত পর্ব্বতের পর

উন্নত পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায়, অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী নীল মেঘমালায় বিজড়িত রহিয়াছে, অথবা অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে! কিন্তু বোধ করি যোদ্ধাগণ এই চমৎকার পর্ব্বতদৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না; অন্য চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে একেবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে, বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রাক্কালে মুহূর্ত্তের জন্যও অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ ও স্তম্ভিত হয়। অদ্য শায়েস্তাখাঁ ও মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা অসমসাহসে মহারাষ্ট্র-সূর্য্য একেবারে চির-অন্ধকারে অস্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা অগত্যা যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন না, ভবানীর আশীর্ব্বাদে অবশ্যই জয় হইবে, সকলেই এইরূপ বলিয়াছিলেন, তথাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ করিবেন। এরূপ ভীষণ কার্য্যে শিবজীও কখন লিপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। কেনই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তামেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশওয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল ছিলেন। অল্পবয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্ম্মাণ করেন। চারি বৎসরাবধি পেশওয়াপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজেলকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হওনাবধি তিনিই পদাতিক সৈন্যের সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদ্‌-কালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতীয় একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলুপন্ত স্বর্ণদেব; কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন, এবং সম্প্রতি রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্তও অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনিই পানাল্লা ও পবনগড় হস্তগত করেন, ও শিবজীর কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্য্যদক্ষ ছিলেন।

অশ্বারোহীর সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইজী পহলকর সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে মোগল সৈন্যের সম্মুখ দিয়া যাইয়া আরঙ্গাবাদ ও আহম্মদনগর ছারখার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা শায়েস্তাখাঁর সভায় চাঁদখাঁর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক্ অশ্বারোহী সেনা কর্ত্তাজী গুজ্জর নামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে শিবজীর তিনজন প্রধান মাউলী বাল্য সুহৃদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল; তন্নজী মালশ্রী ও যশজী কঙ্ক অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্দ্য, যৌবনের বিষম সাহস ইহাঁরা এক্ষণও ভুলেন নাই, শিবজীকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসিতেন, শতবার রজনীযোগে মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত শত পর্ব্বতদুর্গ নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া যেন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধৃমণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান; এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ম্ম ও অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

ধীরে ধীরে বলিলেন, "সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ বিদায় দিন।"

ক্ষণেক সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শেষে মুরেশ্বরপন্ত বলিলেন, "তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন্! বিপদ্কালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি?"

শিবজী। "পেশওয়াজী! ক্ষমা করুন, আর অনুরোধ করিবেন না; আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই; কিন্তু অদ্য ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য্য সাধন করিব, নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আশীর্ব্বাদ করুন জয়লাভ করিব;

নচেৎ যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্য্যে নিধন প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিনজন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলেই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দুগৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।"

পেশওয়া বুঝিলেন আর অনুরোধ করা বৃথা, সুতরাং আর কিছু বলিলেন না। শিবজী পেশওয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য; আশীর্ব্বাদ করুন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী! অন্নজী! আশীর্ব্বাদ করুন, আমি কার্য্যে প্রস্থান করি।" সকলেই বাষ্পোৎফুল্ললোচনে বিদায় দিলেন।

পরে তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাল্যসুহৃদ্! বিদায় দাও।"

দুইজনই খেদে নির্ব্বাক্! ক্ষণেক পর তন্নজী বলিলেন—"প্রভু! কি অপরাধে আমাদের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গজয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্ব্বকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পর্ব্বতগহ্বরে, তরঙ্গিণীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী, আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্য্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই। অনুমতি করুন অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, বিবেচনা করুন আমাদের এস্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই; আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে পরে রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল্যসুহৃদ্‌কে বঞ্চিত করিবেন না।"

শিবজী দেখিলেন তন্নজীর চক্ষে জল; মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই;—শীঘ্র রণসজ্জা করিয়া লও।" দুইজনে বিদ্যুৎগতিতে দুর্গের নীচে অবতরণ করিলেন, তথায় বর্ষাকালের সায়ংকালিক কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির ন্যায় রাশি রাশি সৈন্য সজ্জিত হইতেছিল। শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দুঃখিনী জীজী একাকী একটী ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অদ্যকার বিপদে রক্ষাপ্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময় শিবজী আসিয়া বলিলেন—

"মাতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।"

জীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "বৎস! আইস একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি; কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে।"

শিব। "মাতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে কবে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি? কোন্ যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি?"

জীজী। "বৎস! দীর্ঘ-জয়ী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন!" সস্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন; এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল; এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; উদ্বেগকম্পিতস্বরে বলিলেন—

"স্নেহময়ী জননি! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি; আপনার আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিব।" বীরশ্রেষ্ঠ মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন, মাতৃস্নেহের পবিত্র অশ্রুবারিতে সেই পবিত্র পদযুগল ধৌত করিলেন।

জীজী পুত্রকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, ও বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন, "বৎস! হিন্দুধর্ম্মের জয়সাধন কর; স্বয়ং দেবরাজ শম্ভু তোমার সাহায্য করিবেন।" শিবজী অশ্রুমোচন করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিলেন, নিঃশব্দে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নোমাইল; শিবজী তাহাকে চিনিলেন: জিজ্ঞাসা করিলেন—

"রঘুনাথজী হাবিলদার! তোমার কি প্রার্থনা?"

রঘু। "প্রভু, যেদিন তোরণদুর্গ হইতে পত্রাদি আনিয়াছিলাম, সে দিন প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।"

শিব। "অদ্য এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?"

রঘু। "এই পুরস্কার চাই যে, ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে লিপ্ত হইতে দিন; যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত আপনার সঙ্গে যাইতে আদেশ করুন।"

শিব। "কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সঙ্কটে আসিতেছ? তোমার এই বিষয়েই বা বিশেষ কি অধিকার আছে?"

রঘু। "রাজন্! আমি ক্ষুদ্রতম সেনা, আমার বিশেষ অধিকার কি থাকিবে? এইমাত্র আছে যে, আমার এ জগতে কেহ নাই, অন্যে মরিলে লোকে শোক করিবে, আমি এই আহবে মরিলে আক্ষেপ করিবে এরূপ জনমাত্র লোক নাই। আর যদি প্রভুকে কার্য্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি, তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।"

রঘুনাথের সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনিন্দিত নয়নের উপর পড়িয়াছে, সেইরূপ বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থিরপ্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন, ও সঙ্গে পুনার ভিতর যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া পরে লম্ফ দিয়া অশ্বে অধিরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটী দীপ জ্বলিলে বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনার তাঁহার এই কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল, শিবজী, তন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটী বৃহৎ বাগানে পঁহুছিয়া তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই আম্রকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতলবায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল, সন্ধ্যার পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্ম্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলী নির্ব্বাণ হইল, নিস্তব্ধ নগরে কেবল প্রহরীগণ এক একবার উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শৃগালের শব্দ বায়ুপথে আসিতে লাগিল।

ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল; শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল; সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার চাহিয়া দেখিলেন; বহুলোকে দীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে;—এই বরযাত্রা!

বরযাত্রা নিকটে আসিল। পুনার চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পথ লোকে সমাকীর্ণ, ও নানা বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চ রব হইতেছে। অনেকে অশ্বারোহী, অধিকাংশ পদাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বাল্যসুহৃদ তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র। 'হয়ত এই শেষ বিদায়'—এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্যে অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রীগণ শায়েস্তাখাঁর বাটীর নিকট দিয়া যাইল, বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহুলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রীগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন; যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন খাঁ সাহেবের গৃহের নিকট লুক্কায়িত রহিলেন। ক্রমে বরযাত্রার গোল থামিয়া গেল। শুভকার্য্য সম্পাদন হইল।

রজনী আরও গভীর হইল; শায়েস্তাখাঁর রন্ধনগৃহের উপর একটী গবাক্ষ ছিল, তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল, খাঁ সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পর আর একখানি সরিল, ঝুর ঝুর করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা! পিপীলিকা সারের ন্যায় যোদ্ধাগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তখন চীৎকার শব্দ করিয়া যাইয়া শায়েস্তাখাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধিপ্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনা হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন।

পলায়নার্থে এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন বর্ম্মধারী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা! অন্য দ্বারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময়ে সভয়ে শুনিলেন "হর হর মহাদেও" বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টন করিল।

শীঘ্রই ভীষণ রবে সেই প্রাসাদ পরিপূরিত হইল; কোন ঘরের দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ পিশাচের ন্যায় চীৎকার করিয়া হত্যা করিতে লাগিল; কোন ঘরে মশালের আলোকে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে, কবাটের ঝন্ঝনা শব্দ, আক্রমণকারিদিগের মুহুর্মুহুঃ উল্লাসরব, ও আক্রান্ত ও আহতদিগের চীৎকারে ও আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপুরিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্শাহস্তে লম্ফ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন। "সনাতন ধর্ম্মের জয় হউক" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরীগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্শাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া শায়েস্তাখাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল; শিবজী দেখিলেন সর্ব্বসম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর বিক্রমশালী পুত্র শমশের খাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য! শিবজী এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইলেন; কোষে খড়্গ রাখিয়া বলিলেন, "যুবক, তোমার পিতার রক্তে এক্ষণও আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দেও।"

"কাফের! হত্যাকারীর এই দণ্ড!" শম্শের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জলন্ত, শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বেই শম্শেরের উজ্জ্বল খড়্গ আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভবানীর নাম লইলেন; সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটী বর্শা আসিয়া খড়্গধারী শমসেরকে ভূতলশায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন রঘুনাথজী হাবিলদার! "হাবিলদার! এ কার্য্য আমার স্মরণ থাকিবে।" কেবল এই মাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ষ দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া শায়েস্তাখাঁ পলাইলেন। কয়েক জন মাউলী সেই গবাক্ষমুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল তাহা শায়েস্তাখাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটী অঙ্গুলী ছেদন হইল, কিন্তু শায়েস্তাখাঁ আর পশ্চাতে না দেখিয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার পুত্র আবদুল ফতেখাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইয়াছিল। তখন শিবজী দেখিলেন ঘর, প্রাঙ্গণ, বারন্দা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরীগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলাতকগণের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, ও তখনও মাউলীগণ; মোগলদিগের ধ্বংস সাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অস্পষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্তপ্রণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে সকল যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন ও শত্রুরও সেরূপ প্রাণনাশ যাহাতে না হয় যথেষ্ট যত্ন করিতেন। আদেশ করিলেন, "আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে, ভীরু শায়েস্তাখাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না; এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।"

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন ও সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন, প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক্ মশাল জ্বলিল; পুনা হইতে শায়েস্তাখাঁ দেখিতে পাইলেন মহারাষ্ট্রসেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পর দিন প্রাতে ক্রুদ্ধ মোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল, কর্ত্তাজী গুজর ও তাঁহার অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহিগণ বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গেল।

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শায়েস্তাখাঁ সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না; তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন ও যশোবন্ত অর্থে

বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে এইরূপ জানাইলেন। আরংজীব দুই জনকেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন, ও নিজপুত্র সুল্‌তান মোয়াজীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য যশোবন্তকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া পরে রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন ও নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। আমরা এখন এই নবভূপতির নিকট বিদায় লইব।

পাঠক! বহুদিবস হইল তোরণদুর্গ হইতে আসিয়াছি, চল এই অবসরে একবার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশা।

"মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে,
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ!"

মধুসূদন দত্ত।

যেদিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত ও উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই দিন প্রথম প্রেমের আনন্দময়ী লহরীতে আর একটী বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল। ছাদে সন্ধ্যার সময় যখন সরযুর দৃষ্টি সহসা সেই তরুণ যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকার হৃদয় যেন সহসা অজ্ঞাতপূর্ব্ব উদ্বেগে চমকিত ও স্তম্ভিত হইল। আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদনমণ্ডল, সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অবয়ব দেখিলেন, প্রথম প্রেমের তরঙ্গবেগে বালিকার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সেই উদ্বেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথকে ভোজন করাইতে যাইলেন, পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-বিনিন্দিত অবয়বের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সময়ে সময়ে স্পন্দহীন হইয়া একেবারে চকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। আবশ্যকমতে সম্মুখে আসিলেন, প্রেমবিদগ্ধা বালিকা তখনও নয়ন ফিরাইতে

পারিলেন না; যখন চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন লজ্জাবৃতবদনা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে নূতন একটী ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহার দিকে সোদ্বেগে দৃষ্টি করিলেন কেন? রঘুনাথ এরূপ বিচলিত চিত্ত হইয়া ভোজন করিতেছেন কেন? তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস কি জন্য? হস্ত কাঁপিতেছে কিজন্য? জগদীশ্বর! ঐ দেবপুরুষ কি এই অভাগিনীকে মনে স্থান দিয়াছেন?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয়, মন, প্রাণ সেই দিকে ধাবমান হইল। যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অশ্বারূঢ় হইয়া চলিয়া গেলেন, সরযুর প্রাণটীও লইয়া গেলেন, কেবল দেহমাত্র প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেই মন্দিরে দণ্ডায়মান রহিল। যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন, পুরুষের মন উচ্চাভিলাষে যুদ্ধ-উল্লাসে স্ফীত হইতে লাগিল; রমণী একাকী গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নিঃশব্দে দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু বিমোচন করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় নিঃশব্দে বিদীর্ণ হইতেছিল।

বালিকা একথা মুখ ফুটিয়া বলিবে কিরূপে, এ মর্ম্মভেদী দুঃখ জানাইবে কাহার কাছে?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহী অনেকক্ষণ চলিয়াগিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিষ্পন্দে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দিবালোকে পর্ব্বতমালা অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর, যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বতবৃক্ষ সমুদ্রের লহরীর মত বায়ুতে দুলিতেছে। উপরে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছ জল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। নীচে সুন্দর উপত্যকার গ্রামের কুটীর দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্ব্বতকন্যা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, ও মেঘবিবর্জ্জিত সূর্য্য এই সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-হিল্লোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু সরযু এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন এ সমস্ত দৃশ্যে ন্যস্ত ছিল না। তিনি কেবল একমাত্র পর্ব্বত-পথের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মন সেই দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া বালিকা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার নয়ন পুনরায় জলে আপ্লুত হইল, শীঘ্রই অবারিত ধারা বহিয়া গণ্ড ও বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। বালিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

শূন্যহৃদয়ে সরযুবালা সংসারকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন; স্নেহময়ী কন্যা পিতার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা অবক্তব্য ও অব্যক্ত, প্রফুল্ল মুখখানি কেবল ঈষৎ ম্লান, ধীরে ধীরে পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ধৈর্য্যই রমণীর প্রধান গুণ, ধৈর্য্যই রমণী বাল্যকাল অবধি অভ্যাস করেন। এই বিষম সংসারের নানা শোকদুঃখে, পীড়ায়, যাতনায়, বিষম উদ্বেগে সকল সময়েই নারী ধৈর্য্যধারণ করিয়া সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অসহ্য শোকযাতনা হৃদয়ে গোপন রাখিয়া হাস্যমুখী স্বামীর সেবা করেন, দুর্ব্বহনীয় পীড়া তুচ্ছ করিয়া স্নেহময়ী সযত্নে সন্তানকে লালনপালন করেন। শুনিয়াছি পুরাকালে তাপসেরা ইন্দ্রিয়সুখ তুচ্ছ করিতেন, হেলায় সহস্র যাতনা সহ্য করিতেন। কিন্তু যখন আমি সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি, প্রেমময়ী রমণীকে সহস্র যাতনা, সহস্র দুঃখ, সহস্র অপমান সহ্য করিয়াও স্বামীর দিকে একনিবিষ্টচিত্ত থাকিতে দেখি; যখন স্নেহময়ী জননীকে পীড়া, দারিদ্র্য, সংসারের অসংখ্য ও অসহ্য যন্ত্রণা হেলায় সহ্য করিয়া পুত্রকন্যাদিগকে সযত্নে লালনপালন করিতে দেখি, তখন আমি তাপসদিগের কথা বিস্মৃত হই, সংসারের মধ্যে গৃহস্থিনী তাপসীদিগের সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হই। সরযুবালা রমণী, সুতরাং বাল্যকাল হইতে সহ্যগুণ অভ্যাস করিয়াছিলেন; নিঃশব্দে পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ নিঃশব্দে হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।

সায়ংকালে পিতার ভোজনের সময় নিকটে বসিলেন; স্বহস্তে পিতার শয্যারচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শয়নাগারে যাইলেন, অথবা সেই নিস্তব্ধ রজনীতে পুনরায় ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষপার্শ্বে যাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

পুনরায় প্রভাত হইল, পুনরায় দিন গতে সন্ধ্যা হইল, সপ্তাহ অতীত হইল, মাসকাল অতিবাহিত হইল, সে তরুণযোদ্ধা আর আসিলেন না, তাঁহার কোন সংবাদও আসিল না। সরযুবালা সেই পর্ব্বতপথ চাহিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

"এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি,
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ,
ত্যজি রথ পদব্রজে এস মোর পাশে।"
মধুসূদন দত্ত।

জনার্দ্দন স্বভাবতই সরলস্বভাব লোক ছিলেন, সমস্ত দিন শাস্ত্রানুশীলন বা দেবপূজায় রত থাকিতেন, প্রভাতে ও সায়ংকালে কিল্লাদারের নিকট সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, কদাচ বাটীতে থাকিতেন। তিনি একমাত্র কন্যাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, ভোজনের সময় কন্যাকে নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহার হইত না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প বলিতেন, সরযু বসিয়া শুনিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই আপন কার্য্যে রত থাকিতেন; কন্যাও পূর্ব্ববৎ পিতার সেবা করিতেন, গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা ও কখন কখন ঈষৎ ম্লান মুখখানি জনার্দ্দন লক্ষ্য করেন নাই।

বালিকার হৃদয়ে সহসা যে ভাবগুলি উদয় হয়, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না; একদিন সন্ধ্যাকালে ও একদিন প্রাতে সরযুর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা এক সপ্তাহে বা এক মাসের মধ্যেই বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভব। যদি সরযুর মাতা থাকিত, বা ছোট ছোট ভগ্নী বা খেলিবার সঙ্গিনী থাকিত, বা জ্ঞাতিকুটুম্ব অনেকে থাকিত, তবে সেই মাতাকে দেখিয়া বা খেলায় রত হইয়া সেই নবভাব বিস্মরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সরযু জন্মাবধি একাকিনী, পিতা ভিন্ন তিনি আপনার লোক কাহাকেও কখন দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না, সুতরাং বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চিন্তাশীল। প্রথম যৌবনে যে রূপ দেখিয়া সহসা সরযুর হৃদয় আলোড়িত হইল, মন উন্মত্ত হইল, অপূর্ব্ব সুখের উচ্ছ্বাস হইল, সরযু এখন সেই চিন্তায় মগ্ন হইলেন; দিনে, সায়ংকালে, প্রভাতে সেই চিন্তা করিতেন, সুতরাং সে মূর্ত্তি বিলুপ্ত না হইয়া ক্রমেই হৃদয়ে গভীরাঙ্কিত হইতে লাগিল।

সে চিন্তা কি? সরযু সেই তরুণ সেনাপতির চিন্তা করিতেন। তিনি এতদিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিতেছেন, শত্রু ধ্বংস

করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীরনাম ক্রয় করিতেছেন, এখন কি আর এ অভাগিনীকে স্মরণ আছে? চিরকাল আমাকে স্মরণ রাখিবেন বলিয়াছিলেন, সে কথা কি এখন মনে আছে? পুরুষের মন! নানা কার্য্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, অদ্য এই কার্য্য সাধন করিব, কল্য অপর কার্য্য সিদ্ধ করিব, এইরূপ নানা আশায় অতিবাহিত হয়। আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, জীবন সর্ব্বদা উল্লাসপূর্ণ থাকে। রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্য্যে, নানা চিন্তায় হৃদয় পূর্ণ থাকে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? প্রেম আমাদের জীবন, প্রেম আমাদের জগৎ; জীবিতেশ্বর! সেটীতে যেন নৈরাশ করিও না। ধীরে ধীরে একবিন্দু জল সরযুর গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণযোদ্ধা কি এখনও এ অভাগিনীর কথা ভাবেন? এ কালে এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির আছে? হায়! নব নব আনন্দে আমার কথা অনেক দিন বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহার রমণীর অভাব কি? সুখের অভাব কি? নবীন যোদ্ধা এতদিনে অভাগিনীকে বিস্মৃত হইয়াছেন। হায়! নদীর ঊর্ম্মি পার্শ্বস্থ পুষ্পটীকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে; তাহার পর ঊর্ম্মি কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটী শুকাইয়া যায়, কিন্তু জল আর ফেরে না! আমাদের হৃদয়, আমাদের জীবন পুরুষের খেলার দ্রব্য! মুহূর্ত্তে তাহাদের খেলা সাঙ্গ হয়, পরে রমণীর সমস্ত জীবন খেদ ও দুঃখপূর্ণ! নীরবে সরযু আর একবিন্দু জল মোচন করিলেন।

নিশীথে যখন সেই উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পর্ব্বতমালা চন্দ্রের সুধাকিরণে নিস্তব্ধে সুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র চন্দ্রের দিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত ভাব উদয় হইত, কে বলিবে? বোধ হইত যেন সেই পর্ব্বত-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতেছেন, অশ্ব শ্বেতবর্ণ, আরোহীর সেইরূপ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট ও নয়ন ঈষৎ আবৃত করিয়াছে। যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিলেন, যেন তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ-খচিত শিরস্ত্রাণ, বলিষ্ঠ সুগোল বাহুতে সুবর্ণের বাজু, দক্ষিণহস্তে সেই দীর্ঘ বর্শা; যেন যোদ্ধা আবার আহার করিতে বসিলেন, সরযু তাঁহাকে ভোজন করাইতেছেন; অথবা রজনীতে সেই ছাদে সরযু সেই যোদ্ধার হস্তধারণ করিয়া একবার মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন, হৃদয় ভরিয়া একবার কাঁদিতেছেন। যোদ্ধার প্রশান্ত শীতল

বক্ষে সরযু মুখখানি লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিতেছেন। উঃ! সেদিন কি কখন আসিবে? সে আনন্দময় প্রতিমা কি সরযু আর দেখিতে পাইবে?

চিন্তার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্রের হিল্লোলের ন্যায় একটীর পর আর একটী আইসে, তাহার পর আর একটী। সরযু আবার ভাবিলেন, যেন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরযুকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার সহিত সরযুর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দীপালোক জ্বলিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে সরযু জানে না, ভাল দেখিতে পাইতেছে না। যেন সরযু কম্পিত-কলেবরে সেই দেবপ্রতিমূর্ত্তির নিকট বসিলেন, যেন যুবকের হস্তে আপন স্বেদাক্ত কম্পিত হস্তটী রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। উঃ! আনন্দে বালিকা-হৃদয় স্ফীত হইতেছে, তিনি আনন্দাশ্রু সম্বরণ না করিতে পারিয়া সেই বীরের শীতল হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া মুহুর্মুহুঃ ক্রন্দন করিতেছেন। সরযু! সরযু! পাগলিনী হইও না।

আবার চিন্তা আসিল। রঘুনাথ খ্যাতিপন্ন হয়েন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযু সেই পরম ধনকে পাইয়াছেন। পর্ব্বতের নীচে ঐ যে সুন্দর উপত্যকা দেখা যাইতেছে, যেখানে শান্তবাহিনী নদী চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, যেখানে হরিদ্বর্ণ সুন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রালোকে সুপ্ত রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুটীরের মধ্যে যেন একটী ক্ষুদ্র কুটীর সরযুর! যেন দিবাবসানে সরযু স্বহস্তে রন্ধনকার্য্য সমাপন করিয়াছেন, যেন যত্নপূর্ব্বক জীবিতনাথের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটীরসম্মুখে সুন্দর দূর্ব্বার উপর বসিয়া রহিয়াছেন, পার্শ্বে শিশুসন্তান ক্রীড়া করিতেছে। যেন সরযু দূরক্ষেত্রের দিকে চাহিতেছেন, যেন সেই দিক হইতে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটীরাভিমুখে আসিতেছেন। সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া প্রথমে শিশুকে, পরে শিশুর মাতাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। উঃ! সরযুর মস্তক ঘূরিতে লাগিল, সরযু ধন মান চাহে না, সুবর্ণ রৌপ্য চাহে না, খ্যাতি পদ চাহে না; ভগবন্! সরযুকে সেই ক্ষুদ্র কুটীর, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠটী দাও।

গভীর নিশীথে শ্রান্ত হইয়া সরযূ সেই ছাদে সুপ্ত হইয়া পড়িলেন; অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইলেন; ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র, সহস্র মোগল, সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের ছিন্ন মস্তক বা ছিন্ন বাহু পতিত রহিয়াছে, ক্ষেত্র রক্তে আবৃত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই নবীন যোদ্ধা পড়িয়া রহিয়াছেন! যোদ্ধার বক্ষঃস্থল হইতে রক্তস্রোত বহির্গত হইতেছে ও উজ্জ্বলতাশূন্য নয়নদ্বয় সরযূর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সরযূ শিহরিয়া চীৎকারশব্দে জাগরিত হইলেন, দেখিলেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও এখনও কাঁপিতেছে, তাঁহার দীর্ঘ কেশপাশ, বাহু স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের উপর আলুলায়িতরূপে রহিয়াছে।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস, তিন মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু সে নবীন যোদ্ধা আর আসিলেন না। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল, তাহার পর সুন্দর শরৎকাল শুভ্র চন্দ্র ও তারাবলীকে সঙ্গে লইয়া যেন জগৎকে সুধাপূর্ণ ও শান্ত করিল, কিন্তু সরযূর তপ্ত-হৃদয় শান্ত হইল না। শীত আসিল, চলিয়া গেল, আবার মধুময় বসন্তকাল আসিল, পুষ্পগুলি দেখা দিল, বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মঞ্জরিত হইল, কিন্তু পূর্ব্ববসন্তে সরযূ যে মধুময় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, মধুকালের সহিত তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না।

বৎসরকাল অতীত হইল, সরযূ সেই পর্ব্বতপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সে পথে সে নবীন যোদ্ধা দেখা দিলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নৈরাশ।

> “ বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে
> হারাই সতত জ্ঞান; চেতন পাইয়া
> মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে!”
>
> মধুসূদন দত্ত।

কয়েক মাসের চিন্তার অবশেষে সরযূর শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, মুখ ম্লান হইল, নয়ন দুটী ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত হইল। যে লাবণ্য দেখিয়া দুর্গের সকলেই বিস্মিত হইতেন, সে অপূর্ব্ব প্রফুল্ল লাবণ্য আর নাই, শরীর শীর্ণ, ওষ্ঠ দুইটী শুষ্ক, নয়নের প্রফুল্ল জ্যোতি হ্রাস পাইয়াছে। শরীরে যত্ন নাই, মনেও প্রফুল্লতা নাই। জনার্দ্দন সময়ে সময়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা

করিতেন, "সরযু! তোমার শরীর কাহিল হইতেছে কেন?" অথবা, "সরযু! তোমার খাওয়া দাওয়ার রুচি নাই কেন?" কিন্তু সরযু উত্তর দিতেন না, পিতা কিছু না জানিতে পারেন, এই জন্য ঈষদ্ধাস্য করিয়া অন্য কথা আনিতেন, সুতরাং সরল-স্বভাব জনার্দ্দন কিছুই জানিতে পারিলেন না।

কিন্তু অগ্নি বস্ত্রাবৃত হইলে সেই বস্ত্রকে দাহ করে, যত্নসঙ্গোপিত চিন্তা সরযুর হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল। শরীর আরও অবসন্ন হইতে লাগিল, বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষুর্দ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট হইল, বালিকার শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না, সরযু সঙ্কটজনক পীড়াক্রান্ত হইলেন। ভীষণ জ্বরে শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল, বালিকা জ্বালায় অস্থির হইয়া "জল" "জল" করিতে লাগিল, অথবা সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া নানারূপ কথা কহিতে লাগিল।

জনার্দ্দন যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, কিন্তু কারণ জানিতেন না। শারীরিক পীড়ামাত্র বিবেচনা করিয়া প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনয়ন করিয়া কন্যার চিকিৎসা করাইলেন।

বালিকার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া চিকিৎসকেরাও ভীত হইল। বালিকার শরীর কখন কখন ঘর্ম্মে আপ্লুত হইত, কখন বা শীতে কণ্টকিত হইয়া উঠিত। সর্ব্বদাই অজ্ঞান অবস্থায় থাকিত, নানারূপ কথা উচ্চারণ করিত, কিন্তু তাহা এরূপ তীব্র ও অস্পষ্ট যে কিছুই বুঝা যাইত না।

সূক্ষ্ম রক্তশূন্য অঙ্গুলীগুলি সর্ব্বদাই নড়িত, কখন কখন বালিকা বাহু প্রসারণ করিত, সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠিত, সময়ে সময়ে চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিত।

উঃ! সেই রোগীর মনে কত সময়ে কতরূপ চিন্তার উদ্রেক হইত, তাহার স্বপ্নে কতরূপ আকৃতির আবির্ভাব হইত, তাহা কে বলিবে?

কখন সম্মুখে বিস্তীর্ণ মরুভূমি দেখিত, বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, সূর্য্যের প্রখর তাপে সে বালুকা উত্তপ্ত হইয়াছে, সেই মরুভূমিতে সেই রৌদ্রে বালিকা একাকী গমন করিতেছে। উঃ! তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে, জল! জল! একবিন্দু জল দিয়া প্রাণরক্ষা কর, গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে, জল! জল! জল! সে মরুভূমিতে বৃক্ষ নাই, গ্রাম নাই, কেবল তপ্ত বালুকা, সরযুর পদ দগ্ধ হইতেছে। আকাশে মেঘ নাই, অথবা যাহা আছে তাহাতে উত্তাপ অধিকতর বৃদ্ধি করিতেছে। সরযুকে কে জল দিবে? সহসা অট্টহাস্য শুনা যাইল, সরযু সেই আকাশের দিকে চাহিয়া

দেখিলেন, রঘুনাথ তাঁহার কষ্ট দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছেন; বালিকা ক্রোধে খেদে তর্জ্জন করিয়া উঠিল। সুপ্তরোগী চীৎকার করিয়া উঠিল, চিকিৎসকগণ ভীত হইল।

আবার স্বপ্ন দেখিল। নিবিড় বন অন্ধকার, জনশূন্য! সেই বনের মধ্য দিয়া সরযু বেগে পলাইতেছে, একটা ব্যাঘ্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইতেছে। চীৎকার শব্দ করিয়া সরযু পলাইতেছে, তাঁহার শব্দে বন প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বনের কণ্টকে শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, পদযুগল ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, কিন্তু ভয়ে দাঁড়াইতে পারে না। উঃ! শরীর জ্বলিতেছে, পা জ্বলিতেছে, এ জ্বালা কিছুতে নিবারণ হয় না! সহসা সম্মুখে কি দেখিল? দেখিল সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ভীত সরযুকে বামহস্তে রক্ষা করিলেন, দক্ষিণহস্ত চালনায় খড়্গদ্বারা ব্যাঘ্রকে ধরাশায়ী করিলেন। উঃ! সরযুর প্রাণ শীতল হইল; শ্রান্ত রোগীর অস্থিরতা নিবারণ হইল, রোগী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। চিকিৎসকগণ এই সুলক্ষণ দেখিয়া সেদিন চলিয়া গেলেন।

এইরূপে প্রায় একমাস পর্য্যন্ত সরযু রোগগ্রস্ত ও অজ্ঞান হইয়া রহিল। সময়ে সময়ে রোগের এরূপ তীব্রতা হইত যে, চিকিৎসকেরাও জীবন-আশা ত্যাগ করিতেন। জনার্দ্দন স্ত্রীর মৃত্যু অবধি একরূপ উদাসীন হইয়াছিলেন, শাস্ত্রানুশীলনে ও পূজাকার্য্যেই রত থাকিতেন, একদিনের জন্যও শাস্ত্রপাঠে নিবৃত্ত থাকিতেন না। কিন্তু অদ্য সংসারের মায়া কাহাকে বলে বুঝিলেন; বৃদ্ধ নিরানন্দে সেই শয্যার নিকট বসিয়া থাকিতেন, স্নেহময়ী কন্যার জন্য হৃদয় শোকে উথলিতে লাগিল, সেই কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, নিশীথে অনিদ্র হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন। অনেক দিনে, অনেক যত্নে, ক্রমে ঔষধিসেবনে রোগের উপশম হইতে লাগিল; অনেক দিন পরে সরযু শয্যা হইতে উঠিলেন, অন্ন আহার করিলেন, এদিক্ ওদিক্ পদচারণ করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু তখন বদনমণ্ডল একেবারে পাণ্ডুবর্ণ, শরীরে যেন রক্তমাংস কিছুই নাই।

রজনী একপ্রহর হইয়াছে; ক্ষীণ, দুর্ব্বল সরযু ছাদে উপবেশন করিয়া গ্রীষ্মকালের মন্দ মন্দ নৈশ বায়ু সেবন করিতেছেন। তিনি এখনও অতিশয় ক্ষীণ, শরীরের জ্বালা এখনও সম্পূর্ণরূপে যায় নাই, এই জন্যই বায়ুসেবন করিতে ভালবাসিতেন।

ধীরে ধীরে গত গ্রীষ্মের কথা মনে আসিতে লাগিল, যে যুবক তাঁহাকে বৃথা আশা দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই কথা মনে আসিতেছিল। চিন্তার

তীব্রতা এখন নাই, কেননা শরীর অতি দুর্ব্বল, চিন্তাশক্তিও দুর্ব্বল। যেমন মন্দ মন্দ গতিতে সরযু পদচারণ করিতে পারিতেন, তাঁহার চিন্তাশক্তিও সেইরূপ ধীরে ধীরে পূর্ব্ববৎসরের কথা জাগরিত করিতেছিল।

নিশির মন্দ মন্দ বায়ুতে যেন ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্মৃতি আনিতে লাগিলেন; গলদেশে সেই কণ্ঠমালা দুলিতেছিল, সেইটীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একবিন্দু জল শুষ্ক গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল; ভাবিলেন, "যদিও তিনি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, আমি কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? যতদিন জীবিত থাকিব এই কণ্ঠমালা সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিব।" আর একবিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল, কণ্ঠমালা দিবার সময় যে মিষ্ট কথাগুলি রঘুনাথ বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইল; রঘুনাথের মুখখানি মনে পড়িল, বোধ হইল যেন রঘুনাথ সেই মিষ্টস্বরে আবার ডাকিলেন, "সরযু!"

সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, পরে খেদে অল্প হাসিয়া ভাবিলেন, "হায়! আমি জ্ঞান হারাইলাম না কি? সকল সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাই, এখনই বোধ হইল যেন তিনি সেই মিষ্টস্বরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন! ভগবান্! এ বিড়ম্বনা কেন?"

আবার সেই কোকিল-বিনিন্দিত শব্দ শুনিতে পাইলেন—"সরযু!" সরযু চমকিত হইয়া পশ্চাৎদিকে চাহিলেন, দেখিলেন—রঘুনাথ!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

"দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে স্বজনে!"

মধুসূদন দত্ত।

দেখিতে দেখিতে রঘুনাথ নিকটে আসিলেন, সহসা নত হইয়া সরযুর পদযুগল ধরিয়া বলিলেন, "সরযু! আমাকে ক্ষমা কর, আমার মত পাতকী এ জগতে নাই, কিন্তু তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর।" রঘুনাথের চক্ষুজলে সেই পদযুগল সিক্ত হইল।

[illegible]!

আনন্দে, বিস্ময়ে, লজ্জায়, সরযু বাক্‌শূন্য হইলেন, রঘুনাথকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আর কি করিলেন তিনি জানেন না, আনন্দে তাঁহার শরীর বায়ুতাড়িত পত্রের মত কাঁপিতেছিল। যাঁহার প্রেমময় মুখখানি

একবৎসর অবধি চিন্তা করিতেছিলেন, যাঁহার উপর হৃদয়, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, জগদীশ্বর! সরযূ কি সেই হারাধন ফিরিয়া পাইলেন?

রঘুনাথ পুনরায় কম্পিতস্বরে বলিলেন, "সরযু! তুমি আমার চিন্তা করিয়াছিলে, তুমি পীড়িত হইয়াছিলে, সেই পীড়ায় তুমি আমার নাম করিয়াছিলে;—আর আমি,—আমি কোথায় ছিলাম? সরযু এ পাপিষ্ঠকে কি তুমি মার্জ্জনা করিতে পার?" সরযু চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্রালোকে দেখিলেন সেই কৃষ্ণকেশ-শোভিত, উদার, দেবনিন্দিত মুখখানি সিক্ত,—সেই ভ্রমর-নিন্দিত নয়ন হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে! সরযুর নয়নও শুষ্ক রহিল না।

রঘুনাথ আবার বলিলেন, "উঃ! ঐ পাণ্ডু-বদন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; আমি তোমাকে কত শোক দিয়াছি; তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছিলে?" পরে ধীরে ধীরে আপন বক্ষের উপর সরযুর হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু সরযু! যদি তুমি এই হৃদয়ের ভাব জানিতে; দিবাভাগে, নিশীথে, শিবিরে, ক্ষেত্রে, যুদ্ধমধ্যে ঐ দেবী-বিনিন্দিত মূর্ত্তি কত ভাবিয়াছি যদি জানিতে, তবে বোধ হয় তোমাকে যে দারুণ কষ্ট দিয়াছি তাহাও মার্জ্জনা করিতে। জগদীশ্বর! আমি কি জানিতাম যে সরযুবালা এ অভাগার জন্য চিন্তা করেন, এ অভাগাকে মনে রাখিয়াছেন?"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন, চারি চক্ষুর মিলন হইল, চারি চক্ষুই জলে ছল্ ছল্ করিতেছে, উভয়ের হৃদয় স্ফীত হইতেছে, সরযুর দুইটী হাত রঘুনাথ স্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন, উভয়ের হৃদয় পরিপূর্ণ, মুখে আর বাক্য নাই; মন, প্রাণ, হৃদয়ের বেগবতী চিন্তা যেন সেই সজল নয়নে প্রকাশ পাইতেছে!

চন্দ্র! রঘুনাথ ও সরযুর উপর সুধাবর্ষণ কর; তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখ নাই। তরুণ বয়সে যখন মন প্রথম প্রেম-উল্লাসে উৎক্ষিপ্ত হয়, যখন নবজাত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নবজাত প্রেমের আনন্দ-হিল্লোল মানস-জগতে গড়াইতে থাকে, যখন বহু বিচ্ছেদের পর পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্তপ্রায় হয়, যখন পরস্পরের প্রেমে আনন্দিত হইয়া উভয়ে জগৎ বিস্মৃত হয়, স্থানকাল বিস্মৃত হয়, দোষগুণ বিস্মৃত হয়, নীচে পৃথিবী, উপরে আকাশ বিস্মৃত হয়, কেবল সেই প্রণয়সুখ ভিন্ন সমুদয় বিস্মৃত হয়,—তখন, তখনই যেন এ জগতে ইন্দ্রপুরী অবতীর্ণ হয়!

চন্দ্র! আরও সুধাবর্ষণ কর। বায়ু! ধীরে ধীরে বহিয়া যাও; এরূপ সুখের স্থানে তুমি কখনও বহিয়া যাও নাই। সরযু অনুচিত কার্য্য করিতেছেন তাহা জানেন না, অজ্ঞাত পুরুষের হস্তধারণ করিয়া আছেন তাহা জানেন না; কেবল যে মূর্ত্তি একবৎসরকাল ধ্যান করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন এইমাত্র জানেন, কেবল সেই নবীন মুখমণ্ডল, সেই চক্ষু, সেই কেশ, সেই ওষ্ঠ দেখিতেছিলেন, এইমাত্র জানেন। আর রঘুনাথ! একি ভদ্রোচিত কার্য্য? রঘুনাথ জানেন না, রঘুনাথ উন্মত্ত!

সেই চন্দ্রালোকে নিস্তব্ধ নিশাকালে রঘুনাথ সংক্ষেপে আপন বিবরণ সরযুকে জানাইলেন, সরযু পুলকিতশরীরে সেই মিষ্ট কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। একবৎসরকাল অবধি রঘুনাথ নানা স্থানে; নানা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তোরণে আসিবার জন্য একদিনেরও সাবকাশ পান নাই। এক্ষণে শিবজী রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি লইয়াছেন, দেশশাসন-প্রণালীতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, রঘুনাথ বিদায় পাইয়াছেন। রঘুনাথ দরিদ্র হাবেলদার মাত্র, তাঁহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই, তিনি সরযু-রত্নকে কিরূপে পাইবেন? জগদীশ্বর সহায় হউন, রঘুনাথ চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না, রঘুনাথ সেই রত্নটি কুড়াইয়া বক্ষে ধারণ করিবেন, অথবা চেষ্টায় অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিবেন। রঘুনাথ অদ্যই দুর্গে আসিয়াছেন, আসিয়াই সরযুর পীড়ার কথা শুনিয়াছিলেন, রাত্রিতে একবার সরযুকে গোপনে থাকিয়া দেখিবেন বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সে পাণ্ডুবদন দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই, ধীরে ধীরে নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, নিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, সরযু তাহা মার্জ্জনা করিবেন। রঘুনাথ পুনরায় কল্যই চলিয়া যাইবেন, কিন্তু দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবে, সরযুর চিন্তা, সরযুর মুখখানি কখনও বিস্মৃত হইবেন না। সরযুকে এক একবার এই দরিদ্র সেনার জন্য চিন্তা করিবেন।

পুলকিতশরীরে সরযু মধুর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, আহা! তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল হইল, দগ্ধ শরীর জুড়াইল। কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়াছে, পিতা শয়ন করিয়াছেন, সরযুর কি রঘুনাথের নিকট বসিয়া থাকা উচিত? এই কথা সহসা মনে জাগরিত হওয়ায় সরযু উঠিলেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, পরে বলিলেন—

"রঘুনাথ!" সেই মিষ্ট নামটী উচ্চারণ করিয়াই লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রঘুনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিলেন, "সরযু! সরযু! আর একবার ঐ মিষ্টস্বরে ঐ নামটী উচ্চারণ কর, এক বৎসরের চিন্তা অদ্য বিস্মৃত হইব, এক বৎসরের কষ্ট অদ্য তুচ্ছজ্ঞান করিব।"

সরযু লজ্জা সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! জগদীশ্বর তোমাকে নিরাপদে রাখুন, তোমাকে জয়ী করুন! এ অভাগিনীর তাহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই। তাহা ভিন্ন জীবনে অন্য চিন্তা নাই।" ধীরে ধীরে সরযু শয়নাগারে যাইলেন।

সেদিন রঘুনাথ তোরণ-দুর্গে রহিলেন, পরদিন প্রাতে কিল্লাদারের নিকট বিদায় লইয়া দুর্গ ত্যাগ করিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল; সরযুর চিন্তা পূর্ব্ববৎ বলবতী, কিন্তু পূর্ব্ববৎ খেদযুক্তা নহে। তিনি আনন্দের, সুখের চিন্তাই করিতেন; মায়াবিনী আশা কাণে কাণে বলিত, "শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইবে, শীঘ্র রঘুনাথ জয়ী হইবেন, তখন তিনি এ অভাগিনীকে বিস্মৃত হইবেন না।" সরযুর শরীরও পূর্ব্ববৎ পুষ্টতা ও লাবণ্য ধারণ করিল। দেখিয়া জনার্দ্দন পুনরায় নিশ্চিত হইলেন, পুনরায় শাস্ত্রানুশীলনে মন দিলেন।

কয়েক মাস পরে সংবাদ আসিল, যে সম্রাট্ অম্বরাধিপতি জয়সিংহকে শিবজীর সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। জনার্দ্দন পূর্ব্বপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়ই উৎসুক হইলেন; কিল্লাদারের অনুমতি লইয়া তোরণ-দুর্গ হইতে যাত্রা করিলেন। জনার্দ্দন সরলহৃদয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে শত্রুশিবিরে যাইতে দিতে কিল্লাদার বা শিবজী কোন আপত্তি করিলেন না; বিশেষ ভদ্রাচরণদ্বারা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন হয় শিবজীর এই ইচ্ছা ছিল, জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি কদাপি সম্মত ছিলেন না।

সমস্ত স্থির হইল, জনার্দ্দন কন্যার সহিত তোরণদুর্গ ত্যাগ করিলেন, কন্যার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল!—কেন?

সরযুর চিন্তামালিন্য দূর হইল, সরযুর লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইল, সরযুর হৃদয়াশয় দুরু দুরু করিতেছে, সরযুর মুখে সর্ব্বদা হাসি!

সরযুর আনন্দে পিতা আরও আনন্দিত হইলেন, উভয়ে নিরাপদে রাজা জয়সিংহের শিবিরে পৌঁছিলেন। পাঠক! আমরা তোরণদুর্গে থাকিয়া কি করিব, চল আমরাও সেই স্থানে যাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাজা জয়সিংহ।

"নরকুলোত্তম তুমি——————
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে।"
মধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আরংজীব শায়েস্তাখাঁ ও যশোবন্তসিংহ উভয়কেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, ও নিজ পুত্র স্থলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, ও তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায় সম্রাট্ অবশেষে তাঁহাদের স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলাওয়রখাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসের শেষযোগে জয়সিংহ পুনায় উপস্থিত হইলেন। শায়েস্তাখাঁর ন্যায় নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া তিনি দিলাওয়রখাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, ও স্বয়ং সিংহগড় বেষ্টন করিয়া রাজগড় পর্য্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

শিবজী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ও পরাক্রম তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না। সেরূপ পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট্ আরংজীবের আর কেহই ছিলেন না, ও তাৎকালিক ফরাসী ভ্রমণকারী বর্ণীয়র লিখিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের ন্যায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভগ্নোদ্যম হইলেন, ও বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেম। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ চতুর শিবজীকে জানিতেন, এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না, অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন, ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুরতা করিতেছেন না, তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রোচিত সম্মান তিনি জানেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "দ্বিজবর! আপনার বাক্যে আমি

আশ্বস্ত হইলাম; রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, সেজন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না।” রঘুনাথ এই আশ্বাসবাক্য শিবজীর নিকট লইয়া গেলেন।

ইহার কয়েক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল—

“মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।”

সভাসদ্ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে যাইলেন। বহু সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরাভ্যন্তরে আনিলেন ও রাজগদিতে আপনার দক্ষিণদিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক মিষ্টালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন, “রাজন্! আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এই শিবির আপনার গৃহের ন্যায় বিবেচনা করিবেন।”

শিব। “রাজন্! এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিমুখ? রঘুনাথপন্ত দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।”

জয়। “হাঁ, রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে। রাজন্! আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা করিব, দিল্লীশ্বর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, এ সমস্ত করিব, রাজপুতের কথা অন্যথা হয় না।”

এইরূপে ক্ষণেক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল; শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিলেন না; তখন শিবজী কপটানন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ দেখিলেন তাঁহার চক্ষে জল।

বলিলেন—“রাজন্! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন, সে খেদ নিষ্প্রয়োজন। আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। অদ্যই রজনীতে আমার

অশ্বশালা হইতে অশ্ব বাছিয়া লউন, পুনরায় প্রস্থান করুন, আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে যাইবেন, আমার আদেশে কোনও রাজপুত আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কদাচ বিস্মরণ করিব না।"

রাজা জয়সিংহের এতদূর মাহাত্ম্য দেখিয়া শিবজী বিস্মিত হইলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—

"মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দু-ধর্ম্মের জন্য, যে হিন্দুগৌরবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহদুদ্যম, সে উন্নত উদ্দেশ্য, অদ্য এককালে বিনষ্ট হইল, সে চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু সে বিষয়েও মনস্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সেজন্যও এখন খেদ করিতেছি না।"

জয়। "তবে কিজন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন?"

শিব। "বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব-গীত গাইতে ভালবাসিতাম; অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য, ধর্ম্ম থাকে, তবে রাজপুত-শরীরে আছে। এ রাজপুত কি যবনাধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজা জয়সিংহ কি যবন আরংজীবের সেনাপতি?"

জয়। "ক্ষত্রিয়রাজ! সেটী প্রকৃত দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুতেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করেন নাই, যতদিন সাধ্য দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; বিধির নির্ব্বন্ধে পরাধীন হইয়াছেন। মেওয়ারের বীরপ্রবর প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ অসাধ্য সাধনেরও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ততিও দিল্লীর করপ্রদ, এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত আছেন।"

শিব। "আছি। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি যাঁহাদের সহিত আপনাদিগের এতদিনের বৈরভাব, তাঁহাদের কার্য্যে আপনি এরূপ যত্নশীল কিজন্য?"

জয়। "যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যদান করিয়াছি; যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি তাহা করিব।"

শিব। "সকলের নিকট সকল সময় কি সত্য পালনীয়? যাঁহারা আমাদের দেশের শত্রু, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী, তাঁহাদের সহিত কি সত্য-সম্বন্ধ?"

জয়। "আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতের ইতিহাস পাঠ করুন, সহস্র বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও সত্য লঙ্ঘন করেন নাই। কখন জয়লাভ করিয়াছেন, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছেন, কিন্তু জয়ে, পরাজয়ে, সম্পদে, আপদে, সর্ব্বদা সত্যপালন করিয়াছেন। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সত্যপালনের গৌরব আছে। দেশে, বিদেশে, মিত্রমধ্যে, শত্রুমধ্যে রাজপুতের নাম গৌরবান্বিত! ক্ষত্রিয়রাজ টোডরমল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িশ্যা পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়পতাকা লইয়াছিলেন, কেহ কখনও ন্যস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকটও যাহা সত্য করিয়াছিলেন তাহা পালন করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ! রাজপুতের কথাই সন্ধিপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের কথা লঙ্ঘন হয় নাই!"

শিব। "মহারাজ যশোবন্তসিংহ হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রধান প্রহরী; তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।"

জয়। "যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী সন্দেহ নাই। তাঁহার মাড়ওয়ারদেশ মরুভূমিময়, তাঁহার মাড়ওয়ারী সেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশোবন্ত সেই মরুভূমিতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেনার সহায়ে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম। যদি জয়ী হইয়া আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতেন, আমি তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্মান করিতাম। অথবা যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে বীরপ্রবর প্রতাপের ন্যায় সেই মরুভূমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু যেদিন তিনি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। সে কার্য্য ভাল হউক, মন্দ হউক, ব্রত গ্রহণ করিয়া গোপনে লঙ্ঘন করা ক্ষত্রোচিত কার্য্য হয় নাই; যশোবন্ত কলঙ্কে আপন যশোরাশি ম্লান করিয়াছেন। তিনি সিপ্রানদীতীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, নচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য্য করিতেন না।"

চতুর শিবজী দেখিলেন জয়সিংহ যশোবন্ত নহেন। ক্ষণেক পর আবার বলিলেন—

"হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিচেষ্টা কি গর্হিত কার্য্য? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য্য?"

জয়। "আমি তাহা বলি নাই। যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য্য ত্যাগ করিয়া জগতের সাক্ষাতে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে, আপনার সহিত যোগ দিলেন না? আপনি যেরূপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কিজন্য? সম্রাটের কার্য্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করা কপটাচরণ। ক্ষত্রিয়রাজ! কপটাচরণ কি ক্ষত্রোচিত কার্য্য?"

শিব। "তিনি আমার সহিত প্রকাশ্যে যোগ দিলে দিল্লীশ্বর অন্য সেনাপতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে পরাস্ত ও হত হইতাম।"

জয়। "যুদ্ধে মরণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? ক্ষত্রিয় কি যুদ্ধে মরণ ডরে?"

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন,—

"রাজপুত! মহারাষ্ট্রীয়েরাও মৃত্যু ডরে না, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হয়, হিন্দু-স্বাধীনতা, হিন্দু-গৌরব পুনঃস্থাপিত হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্ত্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব, অথবা রাজপুত! তুমি অব্যর্থ বর্শা ধারণ কর, এই হৃদয়ে আঘাত কর, সহাস্যবদনে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যে হিন্দু-গৌরবের বিষয় বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাহার জন্য শত যুদ্ধ যুঝিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পর্ব্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রুমধ্যে, দিবসে, সায়ংকালে, গভীর নিশীথে, চিন্তা করিয়াছি; আমি মরিলে সে হিন্দুধর্ম্মের, সে হিন্দু-স্বাধীনতার, সে হিন্দু-গৌরবের কি হইবে? যশোবন্ত ও আমি প্রাণ দিলে কি সে সমস্ত রক্ষা হইবে?"

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

"সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্ঘনে হইবে? বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতা-বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তবে বীরের চাতুরীতে হইবে?"

শিবজী পরাস্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পর পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন— "মহারাজ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি, আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা আমি কখনও দেখি নাই, আমি আপনার পুত্রতুল্য!

একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সৎপরামর্শ দিন্। আমি বাল্যকালে যখন কঙ্কণপ্রদেশের অসংখ্য পর্ব্বত ও উপত্যকায় ভ্রমণ করিতাম, আমার হৃদয়ে নানারূপ চিন্তা আসিত, স্বপ্ন উদয় হইত। ভাবিতাম যেন সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য আদেশ করিতেছেন, যেন দেবালয়সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে, ব্রাহ্মণদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, ধর্ম্মবিরোধী মুসলমানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উত্তেজনা করিতেছেন। আমি বালক ছিলাম, সেই স্বপ্নে ভুলিলাম, সদর্পে খড়্গ গ্রহণ করিলাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় করিলাম, দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলাম। যৌবনেও সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি,—হিন্দুনামের গৌরব, হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য, হিন্দু-স্বাধীনতা সংস্থাপন! সেই স্বপ্নবলে দেশ জয় করিয়াছি, শত্রু জয় করিয়াছি, রাজ্য বিস্তার করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন করিয়াছি! ক্ষত্রিয়রাজ! আমার এ উদ্দেশ্য কি মন্দ? এ স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্নমাত্র?—আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন্।”

বহুদূরদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজন্! আপনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছুই আমি জানি না। শিবজী! তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকট অবিদিত নাই, আমি শত্রুর নিকট, মিত্রের নিকট তোমার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছি, পুত্র রামসিংহকে তোমার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব এখনও বিস্মৃত হয় নাই। আর শিবজী! তোমার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে; চারিদিকে যত দেখি, মনে মনে যত চিন্তা করি, বোধ হয় মোগলরাজ্য আর থাকে না,—যত্ন, চেষ্টা সকলই বিফল! মুসলমান-রাজ্য কলঙ্করাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিলাসপ্রিয়তায় জর্জ্জরিত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের ন্যায় আর দাঁড়াইতে পারে না। শীঘ্র কি বিলম্বে এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয় ধূলিসাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হইতেছে, মহারাষ্ট্রীর যৌবন-তেজে বোধ হয় ভারতবর্ষ প্লাবিত হইবে। শিবজী! তোমার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী তোমাকে মিথ্যা উত্তেজনা করেন নাই।”

উৎসাহে, আনন্দে শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তবে ভবাদৃশ মহাত্মা সেই পতনোন্মুখ মোগল প্রাসাদের একমাত্র স্তম্ভস্বরূপ রহিয়াছেন কি জন্য?”

জয়। "সত্যপালন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, যাহা সত্য করিয়াছি তাহা পালন করিব। কিন্তু অসাধ্য সাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত হইবে।"

শিব। "ভাল, সত্য পালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকটও আপনার ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া দেবতারাও বিস্মিত হইয়া আপনার সাধুবাদ করিবেন; কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি চাতুরীদ্বারায়ও স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইয়া থাকি, আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি, তবে সে চাতুরী কি নিন্দনীয়?"

জয়। "ক্ষত্রিয়রাজ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরববৃদ্ধি অনিবার্য্য, বোধ হয় তাঁহাদের বাহুবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু শিবজী! অদ্য যে শিক্ষা আপনি দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিব না। আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্য তাঁহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জয়লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, গুরুর ন্যায় ধর্ম্মশিক্ষা দিন্। অদ্য আপনি মন্দ শিক্ষা দিলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বৃদ্ধ বহুদর্শী রাজপুতের কথা গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সম্মুখরণ শিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্মৃত হইতে বলুন, আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমি শত শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহারাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্য্যের ফল বহুকালব্যাপী, বহুদেশব্যাপী হইবে!"

এই মহৎ বাক্য শুনিয়া শিবজী ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন—

"আপনি গুরুর গুরু! আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য্য; কিন্তু অদ্য আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে দিব?"

জয়। "জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। অদ্য আমার জয় হইল, কল্য তোমার জয় হইতে পারে; অদ্য তুমি আরংজীবের অধীন হইলে, ঘটনাক্রমে কল্য স্বাধীন হইতে পার।"

শিব। " জগদীশ্বর তাহাই করুন, কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি থাকিতে আমার স্বাধীন হওয়ার আশা বৃথা। স্বয়ং ভবানী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

জয়সিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—" শরীর ক্ষণভঙ্গুর, এ বৃদ্ধ শরীর কতদিন থাকিবে?—কিন্তু যতদিন থাকিবে সত্যপালনে বিরত হইবে না।"

শিব। " আপনি দীর্ঘজীবী হউন।"

জয়। " শিবজী! এক্ষণে বিদায় দিন্;—আমি আরংজীবের পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য্য করিতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব, দিল্লীর এ বৃদ্ধ সেনা বিদ্রোহাচরণ্ করিবে না;—কিন্তু ক্ষত্রিয়প্রবর! নিশ্চিন্ত থাক, মহারাষ্ট্রের গৌরব, হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য্য! বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য কর, বহুদর্শিতার কথা গ্রাহ্য কর, মোগলরাজ্য আর থাকে না, হিন্দু-তেজ আর নিবারিত হয় না, তখন দেশে দেশে হিন্দুর গৌরবনাম, তোমার গৌরবনাম প্রতিধ্বনিত হইবে।"

শিবজী অশ্রুপূর্ণলোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, " ধর্ম্মাত্মন্! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন সার্থক হয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি; কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্রবর! আর একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর একদিন পিতার চরণোপান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গবিজয়।

"চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে।"

মধুসূদন দত্ত।

শীঘ্রই সন্ধিস্থাপন হইল। শিবজী মোগলদিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ জয় করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিলেন, বিলুপ্ত আহম্মদনগর রাজ্যের মধ্যে যে দ্বাত্রিংশৎ দুর্গ অধিকার বা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও ২০টী ফিরাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট দ্বাদশটীমাত্র আরংজীবের অধীনে জায়গীর-স্বরূপ রাখিলেন। যে প্রদেশ তিনি সম্রাট্কে দিলেন তাহার বিনিময়ে

বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ কতক প্রদেশ সম্রাট্ শিবজীকে দান করিলেন, ও শিবজীর অষ্টমবর্ষীয় বালক শম্ভুজী পাঁচ হাজারীর মনসবদার পদ প্রাপ্ত হইলেন।

শিবজীর সহিত যুদ্ধসমাপ্তির পর রাজা জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই প্রদেশ দিল্লীশ্বরের অধীনে আনিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। শিবজীর পিতা বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন করেন নাই; কিন্তু শিবজীর বিপদ্‌কালে বিজয়পুরের সুলতান সন্ধি বিস্মরণ হইয়া শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের সুলতান আলীআদিলশায়ের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউলী সৈন্যদ্বারা বহুসংখ্যক্ দুর্গ হস্তগত করিলেন।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সদ্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ও পরস্পরের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মাইল। উভয়ে সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন ও যুদ্ধে পরস্পরের সহায়তা করিতেন। বলা বাহুল্য যে শিবজীর একজন তরুণ হাবেলদার সর্ব্বদাই জয়সিংহের একজন পুরোহিতের সদনে যাইতেন। নাম বলিবার কি আবশ্যক আছে?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দ্দনও ক্রমে রঘুনাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগিলেন, সর্ব্বদাই গৃহে আহ্বান করিতেন; রঘুনাথও যখন পারিতেন পুরোহিতের আবাসস্থান আপন আবাসস্থান করিতেন। এরূপ অবস্থায় রঘুনাথ ও সরযুর সর্ব্বদাই দেখা হইত, সর্ব্বদাই কথা হইত, উভয়ের জীবন, মন, প্রাণ প্রথম প্রণয়ের অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত হইতে লাগিল। জগতে রঘুনাথ ও সরযু অপেক্ষা কে সুখী? সরলচিত্ত জনার্দ্দন তাহাদিগের হৃদয়ের ভাব কিছুই বুঝিতেন না, কখন কখন তাহাদিগকে একত্র দেখিতেন বা কথা কহিতে দেখিতেন, কিন্তু রঘুনাথ “বাড়ীর ছেলে,” নিষেধ করিতেন না। রঘুনাথও জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কয়েক মাসের মধ্যে বিজয়পুর-অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটী অতিশয় দুর্গম পর্ব্বতদুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন পূর্ব্বে শত্রুকে তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্যেরাও পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের

নিকটই তাঁহার শিবির ছিল, সায়ংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, একপ্রহর রজনীর সময় গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসমেত দুর্গাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটী উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর রুদ্রমণ্ডল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে যুদ্ধকালে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছে; অন্যান্য দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল জঙ্গল ও শিলারাশিপরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম স্থান দিয়া সেনাগণকে পর্ব্বত আরোহণ করিবার আদেশ দিলেন; তাঁহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন পর্ব্বত-বিড়ালের ন্যায় সেই বৃক্ষ ধরিয়া শৈল হইতে শৈলান্তরে লম্ফ দিতে দিতে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও বৃক্ষের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও বা লম্ফ দিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্য এরূপ পর্ব্বত আরোহণে সমর্থ কি না সন্দেহ। সহস্র সেনা এইরূপে পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে, কিন্তু শব্দমাত্র নাই, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর নিশীথে কেবল নৈশবায়ু এক একবার সেই পর্ব্বতবৃক্ষের মধ্য দিয়া মর্ম্মরশব্দে বহিয়া যাইতেছে।

অৰ্দ্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর একটী উজ্জ্বল আলোক। চিন্তাকুল হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন; শত্রুরা কি তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছেন? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুপ্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বালিয়াছে, যে অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। ক্ষণকাল চিন্তাকুল হইয়া সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে নিজ সৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে বৃক্ষ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় বৃক্ষ, যেখানে ঝোপ, যেখানে শৈলরাশি, সেই সেই স্থান দিয়া বুকে হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দমাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল।

ক্ষণেক পর একটী পরিষ্কার স্থানের নিকট আসিয়া পড়িল, উপর হইতে আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সেস্থান দিয়া সৈন্য যাইলে

উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন; বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে দেখিলেন প্রায় ১০০ হস্ত পরিমাণ স্থানে বৃক্ষমাত্র নাই, পরে পুনরায় বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। এই ১০০ হস্ত কিরূপে যাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, যাইবার কোন উপায় নাই, নীচে দেখিলেন, অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে যাইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলে দুর্গে আসিবার পূর্ব্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী ক্ষণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বাল্যকালের সুহৃদ্ বিশ্বাসী মাউলী যোদ্ধা তন্নজী মালশ্রীকে ডাকাইলেন; দুইজনে সেই বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর তন্নজী চলিয়া যাইলেন, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শরীর সিক্ত, কেশ ও সমস্ত পরিচ্ছদ হইতে জল পড়িতেছে। তিনি শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কি কহিলেন; শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাই হউক, অন্য উপায় নাই।" তিনি পুনরায় সেনাদিগকে চলিবার আদেশ দিলেন, তন্নজী অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

বৃষ্টির জল অবতরণ দ্বারা এক স্থানে প্রস্তর ক্ষয় পাইয়া প্রাণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পার্শ্ব উচ্চ, মধ্য গভীর, বৃষ্টির সময় সেই গভীর স্থান জলে পরিপূরিত হইত, এখনও তাহাতে জল আছে। সেই জল ভাঙ্গিয়া বুকে হাঁটিয়া যাইলে পর সম্ভবতঃ দুই পার্শ্বে উচ্চ পাড় থাকায় শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল ও সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই স্রোতের মধ্য দিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত সহস্র শিলাখণ্ডের উপর দিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে অনন্তনাদে পর্ব্বত-জল অবতরণ করিতেছে, সেই শিলাখণ্ডের উপর দিয়া সেই জল ভাঙ্গিয়া সহস্র সেনা নিঃশব্দে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। অচিরাৎ উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহসা তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা পতিত হইল, শিবজী দেখিলেন তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে! আর একটী তীর, আর একটী, আরও বহুসংখ্যক্ তীর! শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্য জলপ্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা সেইদিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীরনিক্ষেপ থামিয়া গেল, শিবজী বুঝিলেন শত্রুরা সন্দেহ করিয়াছে মাত্র, এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই। তিনি দুর্গদিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটী আলোকের স্থলে দুই তিনটী প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরিগণ এদিক্ ওদিক্ যাইতেছে। তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবলমাত্র ৩০০ হস্ত দূরে। বুঝিলেন সৈন্যগণ সতর্কিত হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবার নহে!

শিবজীর চিরসহচর তন্নজী মালশ্রীও এ সমস্ত দেখিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাজন্! এক্ষণও নামিয়া যাইবার সময় আছে, অদ্য দুর্গ হস্তগত না হয় কল্য হইবে, কিন্তু অদ্য চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে।" বিপদরাশির মধ্যে শিবজীর সাহস ও উৎসাহ সহস্রগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। তিনি বলিলেন, "জয়সিংহের নিকট যাহা বলিয়াছি তাহা করিব, অদ্য রুদ্রমণ্ডল লইব অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব।" শিবজীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, স্বর স্থির ও অকম্পিত, তন্নজী দেখিলেন অন্য পরামর্শ বৃথা, বলিলেন, "বিপদের সময় প্রভু-পার্শ্ব ভিন্ন তন্নজীর অন্য স্থল নাই, অগ্রসর হউন।"

শিবজী নিস্তব্ধে সেই বৃক্ষ-শ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। একদণ্ড কালের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে গোল শুনা যাইল, সেইদিক্ হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্য সকলে সেই দিকে ধাবমান হইল, এদিকে প্রাচীরোপরি যে দুই তিনটী আলোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া যাইল! তখন শিবজী বলিলেন, "মহারাষ্ট্রীয়গণ! শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও। তন্নজী! বাল্যকালের সৌহৃদ্যের পরিচয় অদ্য প্রদান কর।" পরে রঘুনাথজীউকে পার্শ্বে দেখিয়া বলিলেন, "হাবেলদার! একদিন আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলে, অদ্য আমার মান বাঁচাও।" প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূরিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইলেন, অচিরে দুর্গপ্রাচীরের নিকট পঁহুছিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্ব্বতবৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্ম্মরশব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীর হইতে শিবজী পঞ্চাশৎ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময় দেখিলেন প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী ;—বৃক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এইদিকে আসিয়াছে। একজন মাউলী নিঃশব্দে একটী তীর নিক্ষেপ করিল,—হতভাগা প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত জন প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল ; শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিলেন, আর লুক্কায়িত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, সৈন্যকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের “হর হর মহাদেও” ভীষণনাদ গগনে উত্থিত হইল, এক দল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেল, আর এক দল বৃক্ষের ভিতর থাকিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীরারোহী মুসলমানদিগকে তীরদ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া “আল্লাহু আকবর” শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহপরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া আসিয়া বৃক্ষমধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে ভীষণ কাণ্ড হইয়া উঠিল। প্রাচীরের উপরিস্থ মুসলমানেরা সবল বর্শাচালনে আক্রমণকারিদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীরসঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি মৃতদেহে প্রাচীর-পার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, যোদ্ধাগণ সেই মৃতদেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়াই খড়্গ বা বর্শাচালন করিতে লাগিল, রক্তে আক্রান্ত ও আক্রমণকারিদিগের শরীর রঞ্জিত হইয়া যাইল। শত শত মুসলমানেরা বৃক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল ; শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, প্রবলপ্রতাপ আফগানেরাও যুদ্ধে অপটু নহে ; রক্তস্রোত সেই পর্ব্বত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। বৃক্ষের অন্তরালে ঝোপের ভিতর, শিলারাশির পার্শ্বে শত শত মহারাষ্ট্রীয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর ও বর্শা সঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া অবারিতস্রোতে সেই তীর আক্রান্তদিগের সংখ্যা ক্ষীণতর করিতে লাগিল, আক্রমণকারী ও আক্রান্তদিগের ঘন ঘন সিংহনাদে ও আর্ত্তদিগের আর্ত্তনাদে সেই নৈশ গগন কম্পিত হইতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে "শিবজীকি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ উত্থিত হইল মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই সেইদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া মৃতদেহরাশির উপর দাঁড়াইয়া, রক্তাপ্লুত বর্শার উপর ভর দিয়া একজন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা এক লম্ফে রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন; তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী ও দুই একজন প্রহরীকে বর্শা ও খড়্গ চালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে "শিবজীকি জয়" শব্দ করিয়াছিলেন, সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবেলদার!

হিন্দু ও মুসলমান এক মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে চক্‌মক্ করিতেছে, হস্ত, বাহু, পদদ্বয় রক্তে আপ্লুত, বিশাল বক্ষের চর্ম্মে দুই একটী তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘহস্তে রক্তাপ্লুত অতি দীর্ঘ বর্শা, উজ্জ্বল নয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে আবৃত। শত্রুরাও পোতের সম্মুখে ঊর্ম্মিরাশির ন্যায়, এই যোদ্ধার দুই পার্শ্বে মুহূর্ত্তের জন্য সচকিতে সরিয়া গেল, সেই দীর্ঘ বর্শাধারীর নিকট সহসা কেহ আসিল না, মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘবর্শাহস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ক্ষণকাল মাত্র সকলে নিস্তব্ধ রহিল; পরেই আফগানগণ শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে দেখিয়া চারিদিক্ হইতে বেগে আসিতে লাগিল; রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল কৃষ্ণমেঘের ন্যায় আসিয়া বেষ্টন করিল। রঘুনাথ খড়্গ বর্শাচালনে অদ্বিতীয়, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের জীবন সংশয়!

কিন্তু মাউলীগণও ক্ষান্ত রহিল না। রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সকলে সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল; ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, দশ, পঞ্চাশ, দুই তিন শত জন সেই প্রাচীরের উপর বা উভয় পার্শ্বে আসিয়া জড় হইল, ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে দুর্গ পরিপূরিত করিল! সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, তাহারা মহারাষ্ট্রীয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না, কিন্তু তখনও সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া গতিরোধের চেষ্টা করিতেছে।

সেই তুমুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আর একটী বজ্রনাদ উত্থিত হইল; শিবজী ও তন্নজী প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইতেছেন; সৈন্যগণ বুঝিল, আর এস্থানে যুদ্ধের আবশ্যক নাই, সকলেই প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইল। পাঠানগণ-প্রায় হত কি আহত, মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে অসমর্থ!

শিবজী বিদ্যুৎগতিতে কিল্লাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সে প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও সুরক্ষিত, সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের বর্শাঘাতে প্রাচীর ও দ্বারদেশ কম্পিত হইল, কিন্তু ভাঙ্গিল না। শিবজীর আদেশ অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই প্রাসাদ বেষ্টন করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত করিল। শিবজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন, "দ্বার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব, প্রাসাদবাসী সকলে বিনষ্ট হইবে।" নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন, "অগ্নিতে দাহ হইব, কিন্তু কাফেরের সম্মুখে দ্বার খুলিব না।"

তৎক্ষণাৎ শত মহারাষ্ট্রীয় মশাল আনিয়া দ্বারে জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গিগণ তীর ও বর্শানিক্ষেপে প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, শত মহারাষ্ট্রীয় মশালহস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জ্বলিল।

প্রথমে দ্বার, গবাক্ষ, পরে কড়িকাট, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল, সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণনাদে আকাশের দিকে ধাবমান হইল, ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। দুর্গের উপরে, নীচের পল্লিগ্রামে, বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতে ও উপত্যকায় সেই আলোকস্তম্ভ দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল শিবজীর দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে!

বীরের যাহা সাধ্য পাঠান কিল্লাদার রহমৎখাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সঙ্গের যোদ্ধার সহিত বীরের ন্যায় মরিতে বাকি ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, রহমৎখাঁ ও সঙ্গিগণ লম্ফ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন, এক একজন এক এক মহাবীরের ন্যায় খড়্গ চালনা করিতে লাগিলেন, সেই খড়্গ চালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেষ্টন করিল, তাঁহারা শত্রুর মধ্যে চমৎকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া একে একে হত হইতে লাগিলেন। একজন, দুইজন, দশজন হত হইলেন। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্ষীণ, তখনও সিংহবীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে,

চারিদিকে খড়্গ উত্তোলিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের আশা নাই, এরূপ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর আদেশ শ্রুত হইল, "কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণসংহার করিও না।" ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে এমত সময় শিবজী দেখিলেন দুর্গের অপর পার্শ্ব হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় প্রায় ছয়শত আফগান সৈন্য রাশীকৃত হইয়া আসিতেছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেই দিকে গোল করাতে দুর্গের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল; ধূর্ত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্ষণেক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্ব্বতের তল পর্য্যন্ত সেই একশত মহারাষ্ট্রীয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্ব্বত ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া পুনরায় দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। শিবজী অল্পসংখ্যক্ সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে অপর পার্শ্ব হইতে পাঁচ কি ছয়শত যোদ্ধা আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল।

সুতীক্ষ্ণ নয়নে দেখিলেন দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। চারিদিকে পরিখা, তাহার পর প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। তাহার মধ্যে প্রাসাদ, প্রাসাদের দ্বার ও গবাক্ষ জ্বলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তররাশি হইয়াছে। তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিলেন, অধিক সংখ্যক্ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর হইতে পারে না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন; স্বয়ং তন্নজী ও দুইশত সেনা সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তিরন্দাজ রাখিলেন, দ্বারগবাক্ষের পার্শ্বে পার্শ্বে তিরন্দাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্শাধারী যোদ্ধাগণকে সন্নিবেশিত করিলেন; কোথাও প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। তখন হাস্ত

করিয়া তন্নজীকে কহিলেন, “ এই আমাদের শেষ উপায়, কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আসিতে দিবার পূর্ব্বেই বোধ হয় পরাস্ত করা যাইতে পারে, অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিলে তাহারা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। তন্নজী দুইশত সৈন্যসহিত এইস্থানে অবস্থিতি কর, আমি একবার উদ্যোগ করিয়া দেখি।”

তন্নজী। “ তন্নজী এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহারাষ্ট্রীয়ও এস্থানে অবস্থিতি করিবে না! ক্ষত্রিয়রাজ! সম্মুখ যুদ্ধে সকলেই পটু, কিন্তু যদি এস্থান আক্রান্ত হয় তবে আপনি না থাকিলে কাহার কৌশলবলে এ প্রাসাদ রক্ষিত হইবে ? ”

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “ তন্নজী! তোমার কথাই ঠিক! আমি সম্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধলুব্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু না, এই স্থানেই আমার থাকা কর্ত্তব্য। আমার হাবিলদারদিগের মধ্যে কে তিন শত মাত্র সেনা লইয়া ঐ আফগানগণকে অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে?”

পাঁচ, সাত, দশ জন হাবিলদার একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ তাহাদের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া, পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন, “ হাবেলদার! তুমি ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাহুতে অসুরবীর্য্য ধারণ কর, অদ্য তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। রঘুনাথ! তুমিই অদ্য দুর্গবিজয় আরম্ভ করিয়াছ, তুমিই শেষ কর।”

রঘুনাথ নিঃশব্দে ভূমি পর্য্যন্ত শির নমাইয়া তিন শত সেনার সহিত বিদ্যুৎগতিতে নয়নের বহির্গত হইলেন।

শিবজী তন্নজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ঐ হাবেলদার রাজপুতজাতীয়; উহার মুখমণ্ডল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু হাবেলদার কখন বংশের বিষয় একটী কথাও বলে না, আপন অসাধারণ সাহস সম্বন্ধে একটী গর্ব্বিত বাক্যও উচ্চারণ করে না, কেবল যুদ্ধকালে, বিপদ্‌কালে, সেই সাহস ও বিক্রম কার্য্যে পরিণত করে! একদিন পুনায় আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর,—আমি এপর্য্যন্ত কোনও পুরস্কার দিই নাই, কল্য রাজসভায় রাজা জয়সিংহের সম্মুখে রঘুনাথ সাহসের উচিত পুরস্কার পাইবেন।”

রঘুনাথজী যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন নাই; একেবারে তিন শত মাউলীর সহিত বর্শাহস্তে দুর্দ্দমনীয় ভীষণ বেগে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ত্রিংশৎ হস্ত দূর হইতে সকলে অব্যর্থ বর্শা নিক্ষেপ করিল, পরে "হর হর মহাদেও" ভীষণ নাদে ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে যাইয়া পড়িল। সে বেগ অমানুষিক ও অনিবার্য্য, মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রবলপরাক্রান্ত আফগানশ্রেণী ছারখার ও ভিন্ন হইয়া গেল, উন্মত্ত মাউলীদিগের অবারিত ছুরিকা ও খড়্গ আঘাতে আফগানগণ নিপতিত হইতে লাগিল।

কিন্তু আফগানগণও যুদ্ধবিষয়ে অপটু নহেন; শ্রেণীচ্যুত হইয়াও হটিল না, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে যুদ্ধনিনাদ করিয়া মাউলীদিগকে বেষ্টন করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে যে দৃশ্য দৃষ্ট হইল তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য। নিবিড় অন্ধকারে শত্রু মিত্র দেখা যায় না, আপন হস্তের অসি ভাল দেখা যাইতেছে না, মৃতদেহে সেইস্থান পরিপূর্ণ হইল, রক্ত স্রোতরূপে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, বর্শা, খড়্গ, ছুরিকা অবারিত পরিচালিত হইতেছে, যুদ্ধনিনাদে মেদিনী ও গগন পরিপূরিত হইতেছে; বোধ হয় যেন এ মনুষ্যের যুদ্ধ নহে, শত সহস্র রক্তলোলুপ ক্ষুধিত ব্যাঘ্র পৈশাচিক শব্দে পরস্পরকে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিতেছে।

ঘন ঘন ভীষণ নাদে বেষ্টনকারী আফগানগণ মুহুর্মুহুঃ সেই তিন শত যোদ্ধাকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব যোদ্ধৃশ্রেণী কম্পিত হইল না। সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনে মুসলমানেরা সেই বীর-প্রাচীরে আঘাত করিতেছে, কিন্তু পর্ব্বততুল্য সেই বীর-প্রাচীর অনায়াসে সে আঘাত প্রতিহত করিতেছে। মৃতের শরীরে চারিদিকে প্রাচীরের ন্যায় হইয়াছে, মাউলীদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে, আফগানগণ পুনঃ পুনঃ অধিকতর বেগে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে শ্রেণী ভিন্ন হইল না।

সহসা "শিবজীকি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ হইল, সকলে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, দুর্গের তিন চারি স্থলে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা অগ্নিতে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ও সেইদিক্ হইতে যুদ্ধনিনাদ করিয়া আরও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আসিতেছে। যে একশত জন মহারাষ্ট্রীয় ধূর্ত্ততার সহিত আফগান সৈন্য দুর্গের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আফগানগণ দুর্গে প্রত্যাগমন করিলে তাহারাই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক্ষণে সেইদিক্ হইতে আসিয়া কয়েকটী গৃহে অগ্নিদান করিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। আফগানদিগের দুর্গ শত্রু-হস্তগত হইয়াছে, প্রাসাদ জ্বলিয়া গিয়াছে, অন্যান্য অট্টালিকা

জ্বলিতেছে, সম্মুখে শত্রু, পশ্চাতে শত্রু, মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহারা করিয়াছিল, আর পারিল না, একেবারে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, মহারাষ্ট্রীয়গণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিল। রঘুনাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন, "পলাতককে বন্দী কর, হত্যা করিও না; শিবজীর আদেশ পালন কর।" পলাতকগণ অস্ত্র বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণ যাচ্ঞা করিল,—তাঁহাদিগের প্রাণরক্ষা হইল।

তখন রঘুনাথ দুর্গের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রহরী সংস্থাপন করিলেন; গোলা, বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘরে আপন প্রহরী সন্নিবেশিত করিলেন, বন্দীদিগকে একটী ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; দুর্গের সমস্ত ঘর সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া শিবজীর নিকট যাইয়া শির নমাইয়া সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

ঊষার রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইল; প্রাতঃকালের সুমন্দ শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতে লাগিল; সমস্ত দুর্গ শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ! যেন এই সুন্দর শান্ত পাদপমণ্ডিত পর্ব্বতশেখর যোগীঋষির আশ্রম,—যেন যুদ্ধের পৈশাচিক রব কখন এস্থানে শ্রুত হয় নাই!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিজেতার পুরস্কার।

"ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝ বায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে॥"
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরদিন অপরাহ্ণে সেই দুর্গোপরি অপরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল। রৌপ্যবিনির্ম্মিত চারি স্তম্ভের উপর রক্তবর্ণের চন্দ্রাতপ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত রাজগদীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন। চারি পার্শ্বে সৈন্যগণ বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্ণের বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে শত শত লোক দিল্লীশ্বরের ও জয়সিংহ ও শিবজীর জয়নাদ করিতেছে।

জয়সিংহ সহাস্যবদনে বলিলেন, "আপনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অবধি তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছেন। এ উপকার দিল্লীশ্বর কথনই বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয় হইয়াছে।"

শিবজী। "যেখানে জয়সিংহ সেইখানে জয়।"

সভাসদ্‌গণ সকলে সাধুবাদ করিল। জয়সিংহ আবার বলিলেন, "বোধ করি আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে এই দুর্গ অধিকার করিবেন তাহা আমি কথনই আশা করি নাই!"

শিব। "মহারাজ! দুর্গ-বিজয় বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছি। তথাপি যেরূপ অনায়াসে দুর্গ লইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, সেরূপ পারি নাই।"

জয়। "কেন?"

শিব। "মুসলমানদিগকে সুপ্ত পাইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম সকলে জাগ্রত ও সসজ্জ! পূর্ব্বে কখনও দুর্গজয় করিতে এরূপ যুদ্ধ করিতে হয় নাই।"

জয়। "বোধ করি এক্ষণ যুদ্ধের সময় বলিয়া রজনীতে সর্ব্বদাই শত্রুরা সসজ্জ থাকে।"

শিব। "সত্য, কিন্তু এত দুর্গ জয় করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে এরূপ প্রস্তুত দেখি নাই।"

জয়। "শিক্ষা পাইয়া ক্রমে সতর্ক হইতেছে। কিন্তু সতর্কই থাকুক অথবা নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতি অবারিত, শিবজীর জয় অনিবার্য্য!"

শিব। "মহারাজের প্রসাদে দুর্গ জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কল্য রজনীর ক্ষতি জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে পঞ্চশত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পাইব না।" শিবজী ক্ষণেক শোকাকুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্দীগণকে আনয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎখাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যকার যুদ্ধের পর কেবল তিনশত মাত্র জীবিত আছে। সকলের হস্তদ্বয় পশ্চাৎদিকে বদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে সভাসম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন, "সকলের হস্ত খুলিয়া দাও। আফগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয় দিল্লীশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হও, নচেৎ

আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও,—আমার আদেশে কেহ তোমাদিগের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।"

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না; সকল যুদ্ধে, সকল দুর্গবিজয়ের পর তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়াপ্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন; তাঁহার বন্ধুগণ কখন কখন তাঁহাকে এজন্য দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া আফগানগণ অনেকেই দিল্লীশ্বরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎখাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারও হস্তদ্বয় পশ্চাৎদিকে বদ্ধ, তাঁহার ললাটে খড়্গের আঘাত, বাহুতে তীর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু বীর তখনও সদর্পে সভা-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া স্বয়ং আসনত্যাগ করিয়া খড়্গের দ্বারা হস্তের রজ্জু কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

"বীরপ্রধান! যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার হস্তদ্বয় বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দীরূপে ছিলেন, আমার সে দোষ মার্জ্জনা করুন, আপনি এক্ষণে স্বাধীন; আপনার বীরত্বের কথা কি বলিব; জয় পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।"

রহমৎখাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্থির গর্ব্বিত নয়নের একটী পত্রও কম্পিত হয় নাই; কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভদ্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধসময়ে শত্রুমধ্যে কেহ কখনও রহমৎখাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অদ্য বৃদ্ধের দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহমৎখাঁ মুখ ফিরাইয়া তাহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—

"ক্ষত্রিয়রাজ! কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি পাদসাহের উপর পাদসাহ, জমীন ও আসমানের সুলতান, তিনি এইজন্য আপনাকে নূতন রাজ্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন।" বৃদ্ধের নয়ন হইতে আর দুই বিন্দু জল পড়িল।

রাজা জয়সিংহ কহিলেন, "[illegible]! আপনারও উচ্চপদের যোগ্যতা আপনি প্রামাণ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাইলে আরও পদবৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে

পারি যে আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন?”

রহমৎখাঁ উত্তর করিলেন, “মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাঁহার কার্য্য করিয়াছি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না; যতদিন এ হস্ত খড়্গ ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্য ধরিবে।”

শিবজী বলিলেন, “তাহাই হউক। আপনি অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পঁহুছিয়া দিবে।” এই বলিয়া রহমৎখাঁকে যথোচিত সম্মান ও শুশ্রূষা করিবার জন্য কয়েক জন প্রহরীকে আদেশ দিলেন।

রহমৎখাঁ স্থিরনেত্রে ক্ষণেক শিবজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ক্ষত্রিয়বর! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলে প্রভুভক্ত নহে। কল্য দুর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সসজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধানদাতা আপনারই এক জন সেনা। ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্য লঙ্ঘন করিব না।” রহমৎখাঁ ধীরে ধীরে প্রহরিগণের সহিত প্রাসাদাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার বন্ধুগণ বুঝিলেন এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বৃথা, তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল অদ্য প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “ক্ষান্ত হউন, একের দোষে সমস্ত সৈন্যের উপর ক্রোধ অনুচিত।” পরে শিবজীর সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

“এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে তোমরা কখন্ জানিয়াছিলে?”

সৈন্যগণ উত্তর দিল, “এক প্রহর রজনীতে।”

জয়। “তাহার পূর্ব্বে কেহই এ কথা জানিতে না?”

সৈন্য। “রজনীতে কোন একটী দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে তাহা জানিতাম না।”

জয়। “ভাল, কোন্ সময়ে তোমরা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলে?”

সৈন্য। “অনুমান দেড়প্রহর রজনীর সময়।”

জয়। "উত্তম ; এক প্রহর হইতে দেড়প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে ? 'অমুক উপস্থিত নাই,' 'অমুক কোথায় গিয়াছে ?' 'অমুক আসিল না কেন ?' তোমাদিগের মধ্যে এরূপ প্রশ্ন হয় নাই ? যদি হইয়া থাকে প্রকাশ কর। দেখ একজনের জন্য সহস্র জনের গ্লানি অনুচিত ; তোমরা দেশে দেশে পর্ব্বতে পর্ব্বতে গ্রামে গ্রামে মহাবীর রাজা শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে তাহাকে আনিয়া দাও, যদি সে কল্য রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে তাহার নাম কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের মান কলুষিত হইতেছে ?"

সৈন্যগণ তখন কল্যকার কথা স্মরণ করিতে লাগিল, পরস্পরে কথা কহিতে লাগিল ; শিবজীর রোষ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন, "মহারাজ ! অদ্য যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমি চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।"

চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"রাজন্ ! কল্য এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবেলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, যখন দুর্গতলে পঁহুছিলাম তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।"

ভীষণস্বরে শিবজী বলিলেন, "সে কে, এখনও জীবিত আছে ?"

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ !—একটী নিশ্বাসের শব্দও শুনা যাইতেছে না, সভাতলে একটী সূচিকা পড়িলে বোধ হয় তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"রঘুনাথজী হাবেলদার !"

সকলে নির্ব্বাক, বিস্ময়স্তব্ধ !

চন্দ্ররাও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্ররাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে ঈর্ষ্যার ন্যায় ভীষণ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্ত স্থাপন করিয়া চন্দ্ররাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন—

"নিন্দুক, কপটাচারি ! তোর নিন্দায় রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু মিথ্যা নিন্দুকের শাস্তি সৈন্যেরা দেখুক।"

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্শা উত্তোলন করিয়াছেন, সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ! প্রভু চন্দ্ররাওয়ের প্রাণসংহার করিবেন না, তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।"

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ, নিঃশব্দে সমস্ত সৈন্য রঘুনাথের দিকে অবলোকন করিতেছে!

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—"উঃ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি রঘুনাথ তুমি এই কার্য্য করিয়াছ! তুমি যে প্রাচীর লঙ্ঘনের সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়াছিলে, পরে তিনশত সেনা মাত্র লইয়া দ্বিগুণ সংখ্যক্ আফগানকে পরাস্ত করিয়াছিলে, তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদারকে পূর্ব্বে আক্রমণ-সংবাদ দিয়াছিলে?" শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল।

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "প্রভু, আমি সে দোষে নির্দ্দোষী।" দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিষ্কম্প হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটী পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে, চারিদিকে অসংখ্য লোক সকলে রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে। রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত; তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্ফীত হইতেছে! কল্য যেরূপ অসংখ্য শত্রুমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট মধ্যে যোদ্ধা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তবে কি জন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?"

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্ব্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, নয়নদ্বয় পুনরায় রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন—

"কপটাচারি! এইজন্য এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে? কিন্তু কুক্ষণে শিবজীর নিকট ছলনা চেষ্টা করিয়াছিলে।"

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিতস্বরে বলিলেন,—"রাজন্! ছলনা, কপটাচরণ আমার বংশের রীতি নহে,—বোধ হয় প্রভু চন্দ্ররাও তাহা

জানিতে পারেন।” অদ্য প্রথমে রঘুনাথ আপন বংশের উল্লেখ করিলেন।

রঘুনাথের স্থিরভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতিস্বরূপ হইল, তিনি কর্কশভাবে বলিলেন—

“পাপিষ্ঠ! নিষ্কৃতিচেষ্টা বৃথা! ক্ষুধার্ত্ত সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জ্বলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই।”

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জ্জনা করুন।”

ক্ষিপ্তপ্রায় শিবজী বর্শা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে আদেশ করিলেন—

“বিদ্রোহাচরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড।”

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে সেই তীক্ষ্ণ বর্শা দেখিলেন, সেই অবিচলিত স্বরে বলিলেন—“যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।”

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্শা কম্পিত হইতেছে এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্তধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান বিস্মৃত হইলেন, কর্কশস্বরে কহিলেন—

“হস্ত ত্যাগ করুন; রাজপুতদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সনাতন নিয়ম—বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড; শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।”

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “ক্ষত্রিয়রাজ! অদ্য যাহা করিবেন, কল্য তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলে চিরকাল সেজন্য অনুতাপ করিবেন! যুদ্ধনিয়মে আপনি পারদর্শী, কিন্তু বৃদ্ধ যে পরামর্শ দিতেছে তাহা অবহেলা করিবেন না।”

শিবজী জয়সিংহের ভদ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন, “তাত! আমার পরুষবাক্য মার্জ্জনা করুন, আপনার কথা কখনও অবহেলা করিব না; কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে তাহা কখন মনে ভাবে নাই।” পরে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

“হাবেলদার! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবনরক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখদর্শন করিতে চাহে

না।" তৎক্ষণাৎ পুনরায় বলিলেন, "অপেক্ষা কর; দুই বৎসর হইল তোমার কোষের ঐ অসি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অসির অবমাননা হইবে না। প্রহরিগণ! অসি কাড়িয়া লও, পরে বিদ্রোহীকে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দাও।" প্রহরিগণ সেইরূপ করিল।

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময়ে অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু প্রহরিগণ যখন অসি কাড়িয়া লইতেছিল, তখন তাঁহার শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সে ভীষণ উদ্বেগ সংযম করিলেন, শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত শির নমাইয়া নিঃশব্দে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে, একজন পথিক একাকী নিঃশব্দে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রান্তর পার হইলেন, একটী গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটী পার হইয়া আর একটী প্রান্তরে আসিলেন। অন্ধকার গভীরতর হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, অন্ধকারে সে পথিককে আর দেখা গেল না, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্ররাও জুমলাদার।

"আমা হইতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ,
হৃদে জ্বলে হলাহল।——————"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্ররাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীর্য্য, অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। তাঁহার বয়স রঘুনাথ অপেক্ষা ৫।৬ বৎসর অধিকমাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাঁহাকে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত ললাটে এই বয়সেই দুই একটী চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটী শুক্ল। নয়ন অতিশয় উজ্জ্বল ও তেজোব্যঞ্জক,

কিন্তু চন্দ্ররাওকে যাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন, তাঁহারা বলিতেন যে চন্দ্ররাওয়ের তেজ ও সাহস যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিন্তা এবং ভীষণ অনিবার্য্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটী ভাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইত। দেহ যেন লৌহনির্ম্মিত ও অসীম পরাক্রান্ত, যাঁহারা চন্দ্ররাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ, গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সেই অল্পভাষী স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভয়ানক জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না। এ সমস্ত ভিন্ন চন্দ্ররাওয়ের আর একটী গুণ বা দোষ ছিল, তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না। বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দিবারাত্র জ্বলিত। অসাধারণ বুদ্ধিসঞ্চালনে আত্মোন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেন, অতুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়্গহস্তে সেই পথ পরিষ্কার করিতেন; শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, অপকারী হউক বা পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্ররাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাহাকে পদ-দলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন। অদ্য বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন। এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশবৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করিতেন না, আমরাও জানি না, অতি উন্নত রাজপুতকুলোদ্ভূত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। রাজা যশোবন্তসিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতিসিংহ চন্দ্ররাওকে বাল্যকালে লালনপালন করিয়াছিলেন। অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য্য করিত, গজপতির পুত্রকন্যাকে যত্ন করিত ও সেই সংসারের মধ্যে থাকিয়া কালযাপন করিত।

যখন চন্দ্ররাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষমাত্র, তখনই গজপতি তাঁহার গভীর চিন্তা ও বুদ্ধি, ও দুর্দ্দমনীয় তেজ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজ পুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্দ্ররাওকে ভাল বাসিতেন ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন।

সৈনিকের ব্রতধারণ করিয়া অবধিই চন্দ্ররাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধাগণও বিস্মিত হইত। যুদ্ধে যেস্থানে অতিশয় বিপদ্, যেস্থানে প্রাণনাশের অতিশয় সম্ভাবনা, যেস্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রাশীকৃত হইতেছে, রক্তস্রোত বহিয়া

যাইতেছে, ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যোদ্ধার ভীষণ হুঙ্কারে ও আর্ত্তের আর্ত্তনাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে,—তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের বালক নিঃশব্দে অসুর-বীর্য্য প্রকাশ করিতেছে; মুখে রব নাই, কিন্তু নয়নদ্বয় অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত, ললাট কুঞ্চিত ও বিজাতীয় ক্রোধচ্ছায়ায় কৃষ্ণবর্ণ! যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যেস্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রজনীতে গীত বাদ্য করিতেছে, হাস্য ও আমোদ করিতেছে,—চন্দ্ররাও তথায় নাই; অল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরের অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে, অথবা কুঞ্চিতললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়ংকালে পদচারণ করিতেছে। চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত রাজপুতশিশু নহেন, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছে, গজপতি সিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্ররাও এক্ষণে একজন অসাধারণ সাহসী তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্য্যাদাবৃদ্ধির সহিত চন্দ্ররাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটী যুদ্ধে চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম দেখিয়া গজপতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, বিজয়ের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন, "চন্দ্ররাও! অদ্য তোমার সাহসেই আমাদিগের যুদ্ধে জয় হইয়াছে, ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি?" চন্দ্ররাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভুর সাধুবাদে দাস যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছে, আর অধিক সে কি চাহিতে পারে?" গজপতি সস্নেহে বলিলেন, "মনে ভাবিয়া দেখ, যাহা ইচ্ছা হয় প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্ধি,—চন্দ্ররাও! তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।" চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন—

"রাজপুত বীর কখনও অঙ্গীকার অন্যথা করেন না জগতে বিদিত আছে। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন্।"

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ! গজপতির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল; অসি কোষ হইতে অর্দ্ধেক নিষ্কোষিত করিলেন, কিন্তু সে ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযম করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—

"অঙ্গীকার পালনে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্রদেশে জন্ম, রাজপুতদুহিতাদিগের দস্যু মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত পর্ব্বতকন্দরে ও জঙ্গলমধ্যে থাকিবার অভ্যাস নাই। অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ কর,

পরে মহারাষ্ট্রীয় ভৃত্যের সহিত রাজবংশীয়া বালিকার বিবাহ দিবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে। এখন অন্য কোন যাচ্ঞা আছে?"

সভাস্থ সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন, "অন্য কোন যাচ্ঞা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে প্রভুকে জানাইব।"

সভা ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদারচেতা গজপতি চন্দ্ররাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরাৎ বিস্মৃত হইলেন, সেদিনকার কথা শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। চন্দ্ররাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পদচারণ করিতে লাগিলেন, প্রায় দুই দণ্ড এইরূপে পদচারণ করিলেন, শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধকার চন্দ্ররাওয়ের হৃদয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার সে সময়ের ভাব বর্ণনা করিতে আমারা অশক্ত, সে সময়ে তাঁহার মুখের ভীষণ আকৃতি দেখিলে বোধ হয় স্বয়ং মৃত্যুও চকিত হইতেন।

দুই দণ্ডের পর চন্দ্ররাও একটী দীপ জ্বালিলেন,—একখানি পুস্তকে সযত্নে কি লিখিলেন, পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন। ঈষৎ বিকট হাস্য মুখমণ্ডলে দেখা গেল।

তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চন্দ্র! কি লিখিতেছে?" চন্দ্ররাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি তাহাই লিখিতেছি।"

বন্ধু চলিয়া গেল! চন্দ্ররাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেটী যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্ররাও একটী ঋণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরংজীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী সন্নিধানে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতিসিংহ হত হয়েন, কিন্তু যে তীর তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করে তাহা শত্রুহস্তনিক্ষিপ্ত নহে।

তাহার পর যখন যশোবন্তের রাজ্ঞী পতির সেই যুদ্ধে পরাজয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিলেন, তখন একজন সংবাদ দিল যে গজপতি নামক একজন সেনানীর ভীরুতা ও কপটাচারিতাতেই পরাজয় সাধন হইয়াছে। রাজ্ঞী সে সময়ে বিচার করিতে অসমর্থ, আদেশ করিলেন যে কপটাচারীর সন্তানসন্ততি মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হয়, ও সমস্ত সম্পত্তি রাজাধীনে নীত হয়! গজপতির কপটাচারিতার সংবাদ কে দিল তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইল না।

গজপতির অনাথা বালক ও বালিকা মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হইয়া পদব্রজে অন্য দেশে যাইতেছিল। রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। রাজ্ঞীর ভয়ে হতভাগাদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিতেও কেহ সাহস করিল না। পথিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালকবালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া যাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী, রজনীযোগে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্ররাওয়ের মনোরথ কতকপরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে প্রভূত অর্থ ও মণিমাণিক্য আনিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্রে একজন সমাদৃত সম্ভ্রান্ত লোক হইলেন। "টাকা থাকিলে সব সাজে,"—চন্দ্ররাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অবিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতিসিংহের একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন সকলে দেখিতে পাইল, তাঁহার যথার্থ সাহস বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ, জায়গীর ও বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সমাজে সমাদর করিলেন। চন্দ্ররাও আরও দুই তিনটী বড় ঘরে বিবাহ করিলেন, বড় লোকের সহিত মিশিতে লাগিলেন, বড় রকম চাল অবলম্বন করিলেন। আর কি করিলেন বলার আবশ্যক কি? যে সমস্ত সুন্দর কৌশলে আমরাই "বড়লোক" হই, সমাজের শিরোভূষণ হই, পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করি, সঙ্গে সঙ্গে দম্ভ ও গাম্ভীর্য্যও বৃদ্ধি করি,—চন্দ্ররাও তাহাই করিলেন। তবে চন্দ্ররাও অসভ্য, তিনি স্বহস্তে পিতাস্বরূপ গজপতিকে হনন করিয়া সে উন্নত বংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন,—আমারা সুসভ্য, আমরা চাতুরী ও মোকদ্দমাস্বরূপ সুন্দর উপায়ে কত সোণার সংসার ছারখার করি, কেহ নিন্দা করিতে পারেন না, কেন না এ সভ্য "আইনসঙ্গত" উপায়। চন্দ্ররাও অসভ্য, যুদ্ধে ভীষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপন পদবৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেন, দেশে দেশে যশোবিস্তারের চেষ্টা পাইতেন। আমরা সুসভ্য, বক্তৃতাস্বরূপ বাগযুদ্ধে বা সংবাদপত্রস্বরূপ লেখনীযুদ্ধে ভীষণ বিক্রম দেখাইয়া রাজার নিকট উপাধি প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করি, অচিরে "দেশহিতৈষী মহল্লোক" হইয়া উঠি! চারিদিকে জয়ধ্বনি বাজিতে থাকে, সংবাদপত্রের ভেরী বাজিতে থাকে, দেশে দেশে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে—আমরা "বড়লোক!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীবাই।

"স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা॥"
মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দস্যুবেশী চন্দ্ররাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজস্থান হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়াছিলেন। এক দিন রজনীযোগে তিনি পলায়ন করেন, পর্ব্বতকন্দরে, বনমধ্যে, প্রান্তরে, বা গৃহস্থের বাটীতে কয়েক দিন লুক্কায়িত থাকেন, সুন্দর অনাথ অল্পবয়স্ক বালককে দেখিয়া কেহই মুষ্টিভিক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ নানা স্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত করিল। সংসারস্বরূপ অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল! নানা দেশে পর্য্যটন করিল, নানা লোকের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিল। পূর্ব্ব গৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথা বালকের মনে সর্ব্বদাই জাগরিত হইত, কিন্তু অভিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ কাহাকেও বলিত না, কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি উপবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ভরিয়া রোদন করিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন করিয়া স্বকার্য্যে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হৃদয়ে যেন আপনিই জাগরিত হইতে লাগিল। অল্পবয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিত, প্রভুর অসি কোষে ঝুলাইত! সন্ধ্যার সময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চরণদিগের গান উচ্চৈঃস্বরে গাইত, নৈশপথিকেরা পর্ব্বতগুহায় সংগ্রাম সিংহ বা প্রতাপের গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স তখন রঘুনাথ শিবজীর কীর্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্য্যের কথা চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়দেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয়

উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট যাইয়া একটী সামান্য সেনার কার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অদ্বিতীয়, কয়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন, একটী হাবেলদারী পদে নিযুক্ত করিলেন ও তাহার কয়েক দিবস পরেই তোরণদুর্গে পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

রঘুনাথ হাবেলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিবজীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাও জুমলাদারের অধীনে একজন হাবেলদারের মৃত্যু হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ প্রাপ্ত হয়েন। রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে পিতার পুরাতন ভৃত্য ও আপন বাল্যসুহৃৎ বলিয়া চিনিলেন, পিতৃহন্তা, বা দস্যুরূপী, বা ভগিনীপতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং তিনি সানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইলেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অল্পভাষী জুমলাদারের ললাট অদ্য পুনরায় কুঞ্চিত হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বিক্রমের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল, চন্দ্ররাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। পতঙ্গ বা কীট আমাদের পথের সম্মুখে আসিলে আমরা পদসঞ্চালন দ্বারা দুর্ভাগ্যকে হত করিয়া পথ পরিষ্কার করি,—চন্দ্ররাওও কোন দিন গোপনে রঘুনাথকে হনন করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু যখন রঘুনাথের যশোরাশি তাঁহার নিজের যশকেও ম্লান করিল, যখন লোকে বালকের সাহস দেখিয়া বিক্রমশালী চন্দ্ররাওয়ের বিক্রমও বিস্মৃত হইতে লাগিল, চন্দ্ররাও তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ‘এ বালককে ভীষণতর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক,—ইহার যশ বিনষ্ট করিব।’ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্ররাওয়ের নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মৃত্যুর ছায়া যেন সেই কুঞ্চিত ললাটকে আবৃত করিল।

চন্দ্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মন্ত্রণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অদ্য রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য্য হইতে দূরীকৃত হইলেন!

চন্দ্ররাও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইলেন। পাঠক! চল আমরাও একবার বড়লোকের বাটী সভয়ে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলেন, বহির্দ্বারে নহবৎ বাজিতে লাগিল, দাসদাসী সসব্যস্তে প্রভুর সম্মুখে আসিল, গৃহিণীগণ পতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বেশভূষা করিতে লাগিলেন, প্রতিবাসীগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্ররাওয়ের আগমন-বার্ত্তা সমগ্র গ্রামে রাষ্ট্র হইল।

সায়ংকালে চন্দ্ররাও অন্তঃপুরে আসিলেন, লক্ষ্মীবাই ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণত হইলেন, পরে আহারাদির আয়োজন করিয়া স্বামীকে আহ্বান করিলেন। চন্দ্ররাও আহারে বসিলেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা। বাল্যকালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল বয়সে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে অল্পভাষী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত কোমল পুষ্পের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে দুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে? বালিকা পূর্ব্বকথা স্মরণ করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা স্মরণ করিত, আর গোপনে অশ্রু বর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন শান্ত, সহিষ্ণু হয়। বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবায় রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সহৃদয় ও সদয় হয়েন নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দ্দয় ও বিমুখ হইলেও নারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে প্রণয় বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না, অভিমান, জিঘাংসা, উচ্চাভিলাষ, অপূর্ব্ব বিক্রমে সে হৃদয় পূর্ণ; তথাপি তিনি স্ত্রীর প্রতি নির্দ্দয় ছিলেন না, দাসী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন, লক্ষ্মীও দাসীস্বরূপ স্বামীর যথেষ্ট সেবা করিতেন, স্বামীর স্বভাব জানিয়া সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন, একটী মিষ্ট কথা শুনিলে আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন, স্বামীর একান্ত প্রণয় কি, কখন জানিতেন না, সুতরাং কখন আশা করেন নাই।

এইরূপে সংসারকার্য্যে ও পতিসেবায় এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষ্মী যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শান্ত, নিরুদ্বেগ! পূর্ব্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বাল্যকালের সুখ,

বাল্যকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাথের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু সেই সুন্দর রক্তশূন্য গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া যাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

ক্রমে চন্দ্ররাও আরও চারি পাঁচটী দারপরিগ্রহ করিলেন, কাহারও উচ্চ বংশের জন্য, কাহার বিপুল অর্থের জন্য, কাহারও বিস্তীর্ণ জায়গীরের জন্য, এই সকল কন্যা গ্রহণ করিলেন। চন্দ্ররাও বালক নহেন, প্রণয় বা সৌন্দর্য্যের জন্য কাহাকেও বিবাহ করেন নাই। তথাপি লক্ষ্মীবাই ঘরের গৃহিণী বটে,—তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, তিনি প্রথম স্ত্রী ও প্রসিদ্ধ রাজপুতবংশ-সমুদ্ভূতা এই জন্য। চন্দ্ররাও সকলকেই ভূরি ভূরি গহনা, ভূরি ভূরি অর্থ ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিতেন, কেহ কোথাও যাইলে অনেক দাস দাসী, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক ও বাদ্যকর সঙ্গে দিতেন, সকলেই জানিতে পারিতেন চন্দ্ররাওয়ের পরিবার যাইতেছেন। এ সমস্ত আড়ম্বর তাঁহার আপনার মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য রমণীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য তত নহে। বাটীতে সকল রমণীই পতিকে সমান ভয় করিতেন, দাসীর ন্যায় সকলেই প্রভুর সেবা করিতেন।

চন্দ্ররাও আহারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। ভ্রূযুগল কি সুন্দর সুচিক্কণ, যেন সেই পরিষ্কার শান্ত ললাটে তুলী দ্বারা ন্যস্ত। শান্ত, কোমল, কৃষ্ণ নয়ন দুটীতে যেন চিন্তা আপনার আবাসস্থান করিয়াছে। গণ্ডস্থল সুন্দর, সুচিক্কণ, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, সমস্ত শরীর শান্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা, উন্মত্ততা কৈ? আহা! রাজস্থানের এই অপূর্ব্ব পুষ্পটী মহারাষ্ট্রে সেইরূপ সৌন্দর্য্য ও সুঘ্রাণ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে শুষ্ক, নতশির। পদ্মাসনা লক্ষ্মীর ন্যায় লক্ষ্মীবাইয়ের চারু নয়ন, সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশভার, কোমল সুগোল দেহ দেখিতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্ল সূর্য্যকিরণ নাই, জীবনাকাশ চিন্তামেঘাচ্ছন্ন।

চন্দ্ররাও গজপতিকে হনন করিয়াছেন, লক্ষ্মী ততদূর জানিতেন না, কিন্তু স্বার্থসাধনের জন্য পিতার বংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহা চন্দ্ররাওয়ের আচরণে ও কখন কখন দুই একটী কথা হইতে বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভয়ে সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন চন্দ্ররাও লক্ষ্মীকে জানাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্ররাওয়ের অধীনে হাবেলদার হইয়াছে ও যশোলাভ করিয়াছে। কথাটী সাঙ্গ হইলে চন্দ্র ঈষৎ হাসিলেন; লক্ষ্মী স্বামীকে জানিতেন, সে হাসি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল।

রঘুনাথ কেমন আছেন, কি করিতেছেন, ইত্যাদি নানা ভাবনা সর্ব্বদাই লক্ষ্মীর মনে জাগরিত হইত, কিন্তু স্বামীকে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না, স্বামী বাটী আসিলে তাঁহার অধীনস্থ পদাতিক বা ভৃত্যাদিগকে অর্থে বশ করিয়া গোপনে সংবাদ জানিতেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই ভয় হইত পাছে স্বামী ভ্রাতার অনিষ্টসাধন করেন। কি জন্য এরূপ ভয় হইত তিনি জানিতেন না।

একদিন স্বামীর দুই একটী মিষ্টবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদযুগলের নিকট বসিয়া বলিলেন—"দাসীর একটী নিবেদন আছে, কিন্তু বলিতে ভয় করে।"

চন্দ্ররাও শয়ন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, সস্নেহে বলিলেন—"কি বল না।"

লক্ষ্মী বলিলেন, "আমার ভ্রাতা বালক, অজ্ঞান।"

চন্দ্ররাওয়ের মুখ গম্ভীর হইল।

লক্ষ্মী ভীত হইলেন, কিন্তু তথাপি ভাবিলেন কপালে যাহা থাকে আজ বলিব। প্রকাশ্যে বলিলেন—

"সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অধীন।" চন্দ্ররাও ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

"না, সে আমা অপেক্ষাও সাহসী বলিয়া পরিচিত।"

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে,—চন্দ্ররাও রঘুনাথের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ! ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন—

"বালক যদি দোষ করে, আপনি না মার্জ্জনা করিলে কে করিবে?"

চন্দ্ররাও পরুষস্বরে বলিলেন, "নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের নিকট চন্দ্ররাও পরামর্শ লন না, বিরক্ত করিও না?"

লক্ষ্মী বুঝিলেন চন্দ্ররাওয়ের শরীরে ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে; অন্য বিষয় হইলে আর একটী কথা কহিতেও সাহস করিতেন না, কিন্তু ভ্রাতার জন্য স্নেহময়ী ভগ্নী কি না করিতে পারে? চন্দ্ররাওয়ের পদে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিয়া বলিলেন, "দাসীর নিকট প্রতিজ্ঞা করুন রঘুনাথের আপনি কোন অনিষ্ট করিবেন না।"

চন্দ্ররাওয়ের নয়ন আরক্ত হইল, তিনি লক্ষ্মীকে সজোরে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তাহার পর চন্দ্ররাও অদ্যই প্রথম বাটী আসিয়াছেন, রঘুনাথের যাহা ঘটিয়াছে লক্ষ্মী তাহা জানেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুল, মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিদ্রিত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট ভ্রাতার সংবাদ লইবেন মনে স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্ররাওয়ের আহার সমাপন হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাম্বুলহস্তে তথায় যাইলেন। চন্দ্ররাও তাম্বুল লইয়া বলিলেন—

"এখন যাও, আমার বিশেষ কার্য্য আছে, যখন ডাকিব, আসিও।" লক্ষ্মীর সহিত এই তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্ররাও সতর্কভাবে দ্বাররুদ্ধ করিলেন।

ধীরে ধীরে একটী গুপ্তস্থান হইতে একটী বাক্স বাহির করিলেন, সেটী খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন। দেখিতে হিসাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে গজপতিকর্ত্তৃক যে দিন সভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটী ঋণের কথা লিখিয়াছিলেন, সেই পাত খুলিলেন; সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে;—

"মহাজন..........................গজপতি;
ঋণ..................................অবমাননা;
পরিশোধ হইবে..............তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে,
তাঁহার সম্পত্তি নাশে,
তাঁহার বংশের অবমাননায়।"

একবার, দুইবার, এই অক্ষরগুলি পড়িলেন; ঈষৎ হাস্য সেই বিকট মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেইস্থানে লিখিলেন—

"অদ্য পরিশোধ হইল।"

তারিখ দিয়া পুস্তক বদ্ধ করিলেন।

দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী ভক্তিভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন; চন্দ্ররাও লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "অনেক দিনের একটী ঋণ অদ্য পরিশোধ করিয়াছি।"

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন!

চন্দ্ররাওয়ের সুন্দর অনিন্দনীয় হিসাবে অদ্য একটী ভুল হইল। এ ঋণপরিশোধকার্য্য অদ্য সমাপ্ত হয় নাই,—আর এক দিন হইবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঈশানী-মন্দির।

"——————————হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল।"
মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাওয়ের বাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটী মন্দির ছিল। অনতিউচ্চ একটী পর্ব্বত-শৃঙ্গে সেই মন্দির অতিপ্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তর-রাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটী পর্ব্বততরঙ্গিণী কুল্‌কুল্ শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল অবধি অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্য-নদীতে স্নান করিয়া সোপান আরোহণ করিয়া ঈশানীর পূজা দিত, অদ্য পর্য্যন্ত মন্দিরের গৌরব বা যাত্রীসংখ্যা হ্রাস হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে, পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ বহু পুরাতন বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাযোগেও সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্য সুস্নিগ্ধ স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণকথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপবৃন্দ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ, অসংখ্য হত্যাকাণ্ডে মহারাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এই ক্ষুদ্র শান্ত পর্ব্বতমন্দির আহবের ভীষণ স্বরে কলুষিত করেন নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় কি উদ্বেগ-পরিপূর্ণ! প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পথিক ক্ষণেক দ্রুতবেগে এদিক্ ওদিক্ পদচারণ করিতেছিলেন, ক্ষণেক বা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিতেছিলেন,

ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিষাদে, অদ্য রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ করিতেছিল।

অনেক ক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না; শ্রান্তি বশতঃ কখন পাদপে ভর দিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করেন, পুনরায় নূতন চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া শ্রান্তি বিস্মৃত হয়েন, পুনরায় শীঘ্র বেগে পদচারণ করেন। রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়! এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনা-শক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক! এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে। উন্মত্ততাই কত শত হতভাগার আরোগ্য! কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না!

শরীর অবসন্ন হইল, রঘুনাথ অগত্যা একটী পাদপতলে উপবেশন করিলেন, নিশ্চেষ্টভাবে বৃক্ষে ভর দিয়া উপবেশন করিলেন।

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন। আহা! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্তনিশীথে, শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ গগন-মণ্ডলে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল। এখনও কাশী বা মথুরার পুরাতন মন্দিরে সূর্য্যোদয়ে বা সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে সহস্র ব্রাহ্মণে সেই অনন্ত পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র পাঠ করেন, যখন সেই পুণ্যধামে বহুদেশের বহুযাত্রীর সমাগম দেখি, সনাতন মন্দিরে সনাতন-ধর্ম্মের গৌরব দেখি, সায়ংকালের আরতিশব্দ বা শত মন্দিরের ঘণ্টা ও শঙ্খরব গগনে যুগপৎ উত্থিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে উপবেশন করিয়া গম্ভীর স্বরে বেদপাঠ বা পুরাণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তখন আমি দেশকাল বিস্মৃত হই, আধুনিক সময় ও আধুনিক জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল বিস্মৃত হই, হৃদয়ে নানা স্বপ্নের উদয় হয়, বোধ হয়, যেন সেই প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বাস করিতেছি, চারিদিকে সেই পুরাকালের লোক, পুরাকালের সমাজ ও সভ্যতা, পুরাকালের শান্তি ও সুস্নিগ্ধতা!

সেই সমস্ত মহৎ কথা, পুণ্য কথা; শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণমুখোচ্চারিত হইয়া সেই শান্ত নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে লাগিল, শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতূহলে

পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানবহৃদয় কখন বা প্রফুল্লিত, কখন বা উৎসাহিত, কখন বা গলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুন্দর বঙ্গদেশে, তুষারপূর্ণ কৈলাসবেষ্টিত দূর কাশ্মীরে, বীরপ্রসূ রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রভূমিতে, সাগরপ্রক্ষালিত কর্ণাট ও দ্রাবিড়ে, সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। যেন চিরকালই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখন বিস্মৃত না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, ও অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনা, মগধ, উজ্জয়িনী, দিল্লী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দ্দিনে এই গীত গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ,প্রতাপসিংহ, হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্ব্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল, ক্রন্দনের স্থল, এই পূর্ব্ব গীতমাত্র, যেন বিপদে, বিষাদে, দুর্ব্বলতায় আমরা পূর্ব্বকথা না বিস্মৃত হই, যতদিন জীবন থাকে যেন হৃদয়-যন্ত্র এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে!

নব্য পাঠক! তুমি ইলিয়দ পাঠ করিয়াছ, দান্তে, শেক্সপীয়র, মিল্টন্ পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরসভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতম আলোড়িত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কথা! দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পতিব্রতা-কথা! এই কথা হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে,—এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখন বিস্মৃত না হয়!

পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক সময়ের রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে,—নচেৎ পুস্তক দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ন হইবে না।

শান্তকাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্গীত রঘুনাথের তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শান্তি সেচন করিতে লাগিল। হতভাগার উন্মত্ততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি

ক্ষুদ্র বোধ হইল। ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনাথকে অঙ্কে গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শ্রান্ত অবসন্ন শরীর সেই বৃক্ষমূলে শয়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন, দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন বিক্রম ও যশোবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়! রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকা-পূর্ণ সংসারের সে একটী মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন, দুর্গ জয় করিতেছেন, যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, সেই স্বপ্ন দেখিতেছেন? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শ্রান্ত বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ে বহু দিনের কথা পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে। শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা, সুখ, গৌরব আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর মাড়ওয়ারে ক্রীড়া করিতেন, হাস্য-ধ্বনিতে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শান্ত, ধীর প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল; আহা! সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইবেন? আজি সে সোণার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল আশালহরী কোথায়, এই শোকের দিনে সন্তাপের দিনে যাহার সান্ত্বনা বাক্যে প্রাণ জুড়াইবে এরূপ হৃদয়ের সহোদরা কোথায়? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন? বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতল হস্ত ভ্রাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরার স্নেহ-পূর্ণ নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আহা! বোধ হইল যেন শোকে বা চিন্তায়, লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটী সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, কিন্তু শোকের আবাসস্থান!

রঘুনাথ নয়ন মুদিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিলেন, বলিলেন, “ভগবন্ অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যথিত করিতেছ ?”

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল। রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে,—তাঁহার প্রাণের সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন !

উঃ! রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল ; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটী আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন ;—তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী ! তোমাকে কি এজীবনে আবার দেখিতে পাইলাম ? অন্য সুখ দূর হউক, অন্য আশা দূর হউক, লক্ষ্মী ! তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এ জীবনে আর কিছু চাহে না।” লক্ষ্মীও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিলেন। আহা ! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রত্ন আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে যাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছজ্ঞান না করে ?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেকক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন। বহুদিনের কথা, বাল্যকালের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয় উছলিতে লাগিল ; থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ভগিনীর ন্যায় এজগতে আর স্নেহময়ী কে আছে, ভ্রাতৃস্নেহের ন্যায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে ? আমরা সে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ত, সহৃদয় পাঠক ! রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর মনের ভাব অনুভব করুন।

অনেকক্ষণ পরে দুইজনের হৃদয় শীতল হইল ; তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন, “ঈশানীর ইচ্ছায় কত অনুসন্ধান পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম, আহা, আজ আমার কি পরম সুখ ; দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল !” ক্ষণেক পর আপন অশ্রুবিন্দু বিমোচন করিয়া বলিলেন, “ভাই, এই শীতল বাতাসে আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে, চল মন্দিরের ভিতর যাই ;

আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।" উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ভ্রাতা ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আসিলেন, লক্ষ্মী একটী স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ব্বকথা কহিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথা বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গো বৎস বা মেষপাল রক্ষা করিতেন, মেষের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন বা নির্জ্জনে বসিয়া চরণদিগের গীত গাইতেন। কখন সায়ংকালে নদীকূলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন প্রত্যূষে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ-প্রদেশে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন, এক জন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকের অধীনে কার্য্য করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ ব্যবসায়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন। আজি তিন বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সেই চন্দ্ররাওয়ের ষড়যন্ত্রে অদ্য অপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য মাত্র নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার দুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অবারিত অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন; তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, ভ্রাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সে কথা শেষ হইল, কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া আপনার কি পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররাওয়ের উপর ভ্রাতার যে বিজাতীয় ক্রোধ তাহা তিনি বুঝিলেন, চন্দ্ররাওয়ের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে ভ্রাতার হৃদয়ে কি কষ্ট হইবে, তাহাও বুঝিলেন। ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন ;—

"মহারাষ্ট্রদেশে আসিবার অনতিপরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র জায়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম করে না কিন্তু গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরবজ্যোতির চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী সুখে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে দাসী সুখে আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভ্রাতাকে সুখে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়।

রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্য সেই কামনায় মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, সহসা মন্দিরপার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভ্রাতাকে পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার হৃদয়ে শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের ব্যথা জানিতেন। লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সান্ত্বনা করিতে জানিতেন। সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ্য করা ও সান্ত্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করাই নারীর ধর্ম্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধবাক্য দিয়া ভ্রাতার মন শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমাদিগের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকে না। ভগবান্ যে সুখ দেন তাহা আমরা ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানবজন্মই দুঃখময়, যদি আমরা দুঃখ সহ্য না করিব তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দ্দিন সকলেরই আছে,—দুর্দ্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম লইয়া নিজ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন।"

লক্ষ্মী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

"ভাই! এ নৈরাশ দূর কর; এরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কতদিন থাকিবে? আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কত দিন থাকে?"

রঘুনাথ। "থাকিবার আবশ্যক কি? যেদিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জন্য?"

লক্ষ্মী। "তোমার ভগ্নী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই, আমার আর এজগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎসংসারে কেহ নাই। তুমিও কি দুঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা

ভুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হইলেন?" লক্ষ্মীর নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

রঘুনাথ ক্ষুব্ধ হইয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভালবাস তাহা জানি, তোমাকে যেদিন কষ্ট দিব সে দিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনী! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই,—তুমি স্ত্রীলোক সৈনিকের শোক বুঝিবে কিরূপে, জীবন অপেক্ষা আমাদিগের সুনাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক ও অপযশ সহস্রগুণে কষ্টকর! সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলুষিত হইয়াছে!"

লক্ষ্মী। "তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মহানুভব শিবজীর নিকট যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন, তোমার দোষ নাই, বুঝিবেন।"

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন পিতার অভিমান, পিতার দর্প, পুত্রে বর্ত্তমান্। তিনি প্রাণ থাকিতে অন্যায়াচারীর নিকট আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন, "মার্জ্জনা কর, আমি স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকট যাইতে অস্বীকার কর কার্য্যদ্বারা কেন আপন যশ রক্ষা কর না? পিতা বলিতেন, 'সেনার সাহস ও প্রভুভক্তি সমস্ত কার্য্যে প্রকাশ হয়' যদি বিদ্রোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ করিয়া থাকে, অসিহস্তে কেন সে সন্দেহ খণ্ডন কর না।"

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন ধক্ ধক্ করিতে লাগিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,, "কিরূপে?"

লক্ষ্মী। "শুনিয়াছি শিবজী দিল্লী যাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি স্ত্রীলোক, আমি কি জানিব বল? কিন্তু তোমার পিতার ন্যায় সাহস, তাঁহারই ন্যায় বীরত্ব, প্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য না সফল হইতে পারে?"

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তার সময় থাকিত তবে বুঝিতেন কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানব-হৃদয়শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন; যে ঔষধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়াছিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে শোকসন্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকক্ষণ নিষ্পন্দে চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন, উল্লাসোৎফুল্ল মুখমণ্ডল সহসা নব গৌরব ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—

"লক্ষ্মী! তুমি বালিকা, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার জীবন আর নিরুদ্দেশ্য নহে, আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য নহে। ভগবান সহায় হউন, রঘুনাথজী বিদ্রোহী নহে, ভীরু নহে, এ কথা এখনও প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা, তোমার নিকট এ সমস্ত কহি কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে?"

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন, 'রোগ নির্ণয় করিলাম আমি ঔষধি দিলাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না?' প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভাই! তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব? কিন্তু যাহাই হউক তোমার কনিষ্ঠ ভগিনী যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে।"

রঘুনাথ। "আর লক্ষ্মী! আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা কখন বিস্মৃত হইব না।"

অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"আমার আর একটী কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।"

রঘু। "লক্ষ্মী! আমার নিকট তোমার কি কথা বলিতে ভয় হয়? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয়?"

লক্ষ্মী। "চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার বোধ হয় তোমার অপকার করিয়াছেন।"

রঘুনাথের হাস্য দূর হইল, রোষে জিঘাংসায় ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিলেন। বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

কম্পিতস্বরে দুঃখিনী লক্ষ্মী বলিলেন, "জিঘাংসা মহল্লোকের অনুচিত। ভাই, অঙ্গীকার কর তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।"

রঘুনাথ কর্কশভাবে বলিলেন—

"তিনি যদি আমার সহোদর ভ্রাতা হইতেন তথাপি কপটাচারীকে মার্জ্জনা করিতাম না,—এই অসি দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিব। সে পামরের নাম করিয়া কেন তোমার পবিত্র মুখ কলুষিত করিতেছ?"

লক্ষ্মী স্বভাবতঃ স্থির, শান্ত, বুদ্ধিমতী, কিন্তু স্বামীনিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না। সজলনয়নে সরোষে বলিলেন—

“ভ্রাতার নিকট পূর্ব্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটী কথা বলিলাম তাহা রাখিলে না; আমি পাপীয়সী, আমরা সকলে পামর; বিদায় দাও, আর জন্মের মত ভগিনীকে দেখিতে পাইবে না।”

সস্নেহে, সজলনয়নে রঘুনাথ বলিলেন—

“লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কবে আমি মন্দ কথা বলিয়াছি? চন্দ্ররাওকে আমি মার্জ্জনা করিতে পারি না, কেন সে ভিক্ষা করিতেছ?”

লক্ষ্মী ঝর্ ঝর্ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—“অনাথা ভগিনীর প্রতি কত ভালবাসা আছে তাহাই জানিবার জন্য। ভাই! তাহা জানিলাম। এক্ষণে বিদায় দাও, দুঃখিনীর অন্য ভিক্ষা নাই।”

রঘুনাথ সজলনয়নে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, “লক্ষ্মী! চন্দ্ররাওয়ের জন্য তুমি কেন যাচ্ঞা করিতেছ জানি না, তাহাকে কখনও মার্জ্জনা করিব মনে করি নাই; কিন্তু তোমার নিকট অদেয় আমার কিছুই নাই। এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট করিব না। আমি তাহার দোষ মার্জ্জনা করিলাম—জগদীশ্বর তাহাকে মার্জ্জনা করুন।”

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন, “জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।”

পূর্ব্বদিকে প্রভাতের আলোকচ্ছটা দেখা যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সস্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন—“আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে, এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এইক্ষণেই আমি না যাইলে জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।”

“পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন,” এই বলিয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল আমরা হতভাগিনী সরযূর নিকট বিদায় লইয়া আইসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সীতাপতি গোস্বামী।

"যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক,

*   *   *   *

"যাও যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
"এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণদিনে রঘুনাথের যাইতে কিজন্য বিলম্ব হইয়াছিল, পাঠক মহাশয় অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। যুদ্ধগমনপূর্ব্বে রঘুনাথ প্রাণভরে একবার সরযুকে দেখিতে আসিয়াছিলেন; সাশ্রুনয়নে সরযু রঘুনাথকে বিদায় দিয়াছিলেন। সরযু সেই দিন নয়নের মণি হারাইলেন, জীবনের জীবন হারাইলেন।

এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল, রঘুনাথের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আশা প্রথমে কাণে কাণে বলিতে লাগিল—"রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ রাজসম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী শীঘ্র উল্লাসিত-হৃদয়ে সরযুপার্শ্বে আসিলেন, পরম কুতূহলে সরযুর হস্ত ধরিয়া যুদ্ধের গল্প বলিলেন।" অশ্বের খুরশব্দ হইলেই সরযুর হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইত, তিনি গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া দেখিতেন, পুনরায় ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিতেন। গৃহে দ্রুতপদবিক্ষেপ শুনিলে সরযু চমকিয়া উঠিতেন, পুনরায় নীরবে বসিয়া থাকিতেন।

দিন গেল, রজনী আসিল, পুনরায় দিবস আসিল, এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, রঘুনাথ আর আসিলেন না। সরযু সেই পথ চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত হইলেন, আশা চিন্তায় পরিণত হইল, বালিকার গণ্ডস্থল ক্রমে শুষ্ক হইল, চক্ষুদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে জলপূর্ণ হইতে লাগিল; রঘুনাথ আসিলেন না!

সে চিন্তার অব্যক্তব্য যাতনা প্রকাশ করা যায় না; বালিকা কাহাকে সে কথা বলিবেন? নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, নীরবে গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, অথবা সায়ংকালে সেই ছাদে উঠিয়া সেই অন্ধকার-পরিপূর্ণ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত হইতেন না। সেই উন্নত দেহ কি দূরে দেখা যাইতেছে? সরযুর যোদ্ধা কি যুদ্ধ-উল্লাসে সরযুকে বিস্মৃত

হইলেন ? যুদ্ধে কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে ? সহসা অশ্রুজলে সরযুর নয়ন আপ্লুত হইল, শুষ্ক গণ্ডস্থল দিয়া ধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল !

সহসা বজ্রের ন্যায় সংবাদ আসিল, রঘুনাথ বিদ্রোহী, বিদ্রোহাচরণজন্য অবমানিত হইয়া দূরীকৃত হইয়াছেন ! প্রথম মুহূর্ত্তে সরযু চকিতের ন্যায় রহিলেন, কথার অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ললাট র[illegible]হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইল, শরীর কাঁপিতে[illegible]য়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। দাসীকে বলিলেন, [illegible]লি, রঘুনাথ বিদ্রোহী ? রঘুনাথ মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল [illegible] কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, তোকে কি বলিব, সম্মুখ হইতে দূর হ !” শা[illegible]ভাব সরযুকে এবম্বিধ ক্রুদ্ধ দেখিয়া দাসী বিস্মিত হইল, সসব্যস্তে সরিয়া গে[illegible]

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে লাগিল, “ রঘুনাথ বিদ্রোহী !” বার বার সরযু এই কথা শুনিতে লাগিলেন ; তাঁহার সখীগণ সরযুকে এই কথা বলিলেন ; বৃদ্ধ জনার্দ্দন সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন যে, কে জানে সেই সুন্দর উদারমূর্ত্তি বালকের মনে এরূপ ক্রুরতা ছিল ? সরযু সমস্ত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না, রঘুনাথের বীরত্বে ও সত্যব্রততায় সরযুর যে স্থির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা বিলুপ্ত হইল না। তিনি কাহাকেও কোন উত্তর দিলেন না, তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্য আরক্ত, নয়ন জলশূন্য !

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর এক দিন সন্ধ্যার সময় সরযু সরোবরতীরে যাইলেন ; হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

সহসা পথিমধ্যে সেই নৈশ অন্ধকারে জটাজূটধারী দীর্ঘকায় একজন গোস্বামীকে দেখিতে পাইলেন, ঈষৎ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন ; যত গোস্বামীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযুর হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পর একটী বিষয় চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ প্রভু ! একজন অসহায় নারী আপনার আশ্রয় যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করুন।”

গোস্বামী সরযুর দিকে চাহিলেন, ক্ষণেক স্থিরভাবে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

“ রমণি, আপনার উদ্দেশ্য আমি অবগত আছি, কোন যুবক যোদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন।”

সরযু অধিকতর ভক্তিসহকারে বলিলেন,—

"ভগবন! আপনার গণনাশক্তি অসাধারণ,—যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু বলেন, তবে বাধিত হই।"

গোস্বা। "জগতে সকলে তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানে।"

[illegible] "প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই। প্রকৃত অবস্থা কি?"

[illegible] মহারাজ শিবজী তাঁহাকে বিদ্রোহী জানিয়াই দূর করিয়া দিয়া[illegible]

[illegible] মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, আরক্তনয়নে কহিলেন, "তপস্যা প্রবঞ্চনা বি[illegible]ব, কিন্তু রঘুনাথকে বিদ্রোহী বিশ্বাস করিব না! গোস্বামিন্, আমি বিদায় হই।"

গোস্বামীর নয়ন সহসা জলপূর্ণ হইল,—ধীরে ধীরে বলিলেন, "আরও কিছু আমার বক্তব্য আছে।"

সরযু। "নিবেদন করুন।"

গোস্বা। "মনুষ্যহৃদয় অবগত হওয়া মনুষ্যগণনার অসাধ্য, যোদ্ধার হৃদয়ে কি ছিল জানিবার একমাত্র উপায় আছে।

"শাস্ত্রে লিখে প্রণয়িণীর হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ; যদি রঘুনাথের যথার্থ প্রণয়িনী কেহ থাকে, তাঁহার নিকট গমন করুন, তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে।" গোস্বামী তীব্রদৃষ্টিতে সরযুর দিকে চাহিতেছিলেন।

সরযু আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জগদীশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তিদান করিলে। সেই উন্নতচরিত্র যোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের সত্যব্রতত্বে তাহার স্থির বিশ্বাস বিচলিত হইবে না। হৃদয়েশ! জগতে তোমার অন্যায় নিন্দা করুক, কিন্তু একজন দুঃখিনী বিপদে সম্পদে চিরকাল তোমার যশোগান গাইবে।" সরযুর নয়নযুগল এতক্ষণে জলপূর্ণ হইল, গোস্বামী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন,—তাঁহার দুই নয়ন শুষ্ক ছিল না, তাপসের শান্ত হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।

ক্ষণেক পর কষ্টে আত্মসংযম করিয়া গোস্বামী বলিলেন,—

"ভদ্রে! আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, যে আপনিই সেই যোদ্ধার প্রকৃত প্রণয়িনী। আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে;—আপনার তাঁহাকে কিছু বক্তব্য দেহ।

গোস্বামীর সম্মুখে রঘুনাথকে হৃদয়েশ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সরযূ ঈষৎ লজ্জিত হইলেন; কিন্তু সে ভাব সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

"প্রভুর সহিত তাঁহার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

গোস্বা। "কল্য রজনীতে ঈশানী-মন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।"

সরযূ। "রঘুনাথ আপাততঃ কি করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রভু কি অবগত আছেন?"

গোস্বা। "নিজ বাহুবলে, নিজ কার্য্যগুণে অন্যায় অপযশ তিরোহিত করিবেন, অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করিবেন।"

সরযূ। "ধন্য বীরপ্রতিজ্ঞা! প্রভু! যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, বলিবেন সরযূ রাজপুতবালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে! বলিবেন, সরযূ যতদিন জীবিত থাকিবে রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই চিন্তা করিবে, তাঁহারই যশোগীত গাইবে। ভগবান্ অবশ্য রঘুনাথের যত্ন সফল করিবেন।"

গোস্বা। "ভগবান্ তাহাই করুন! কিন্তু ভদ্রে! সত্যের সর্ব্বদা জয় হয় না,—বিশেষ রঘুনাথ যে দুরূহ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয়ও আছে।"

সরযুর নয়নদ্বয় সহসা জলপূর্ণ হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সদর্পে সে জল মোচন করিয়া বলিলেন,—

"রাজপুতের সেই ধর্ম্ম! আপনি তাঁহাকে জানাইবেন, যদি কর্ত্তব্য-সাধনে হৃদয়েশের প্রাণবিয়োগ হয়,—তাঁহার দাসী তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে!"

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; গোস্বামীর বাক্‌শক্তি ছিল না। অনেকক্ষণ পরে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলিয়াছিলেন?"

গোস্বামী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উদ্বেগকম্পিতস্বরে বলিলেন—"আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী বলিয়া জগৎ যাহাকে ঘৃণা করিবে আপনি কি তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন? জগতে যাহার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি কি মনে মনে তাহার নাম স্মরণ করিবেন? জগতে কি একজনও বিদ্রোহী রঘুনাথকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানিবেন;—ঘৃণিত, অবমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে ঐ শীতল হৃদয়ে স্থান দিবেন?" সন্ন্যাসীর কণ্ঠরোধ হইল।

সরযূ বলিলেন, "প্রভু! সে বিষয় কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? সরযূ রাজপুতবালা, অবিশ্বাসিনী নহে।"

গোস্বা। "জগদীশ্বর! তবে আর তাহার হৃদয়ে কষ্ট নাই, লোকে যদি মন্দ বলে, তিনি জানিবেন একজন এখনও রঘুনাথকে বিশ্বাস করে!

এক্ষণে বিদায় দিন্; আমি এই কথাগুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন হইবে!"

সজলনয়নে সরযূ বলিলেন, "আরও বলিবেন, তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্য আমি প্রতিরোধ করিব না, অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ, তিনি তাঁহার সহায় হইবেন! আর যদি এই উদ্যমে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটে, জানিবেন, তাঁহার চিরবিশ্বাসিনী সরযূও এ অকিঞ্চিৎকর জীবন বিসর্জ্জন করিবে।"

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন। সরযূ বলিলেন, "প্রভু! আমার হৃদয় শান্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

গোস্বামী চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সীতাপতি গোস্বামী!"

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল! সেই অন্ধকারে একজন গোস্বামী একাকী রায়গড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রায়গড় দুর্গ।

"ধিক্ দেব, ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি?"
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় কয়েক দিন পর, শিবজীর তদানীন্তন রাজধানী রায়গড়ে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটী সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী ও দূরদর্শী বিচক্ষণ পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত যোদ্ধা, ধীশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণতনু শুক্লকেশ বহুদর্শী ন্যায়শাস্ত্রী, সভাতল সুশোভিত করিয়াছেন; যুদ্ধব্যবসায়ে, বুদ্ধিসঞ্চালনে বা বিদ্যাবলে ইহাঁরাই শিবজীর

চিরসহায়তা করিয়াছেন, শিবজীর ন্যায় ইঁহাদেরও হৃদয় স্বদেশানুরাগে পূর্ণ, হিন্দুদিগের গৌরব সাধন জন্য ইঁহারা দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে অনিদ্র হইয়া চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অদ্য সে চেষ্টা কোথায়, সে উৎসাহ কোথায়? সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ অদ্য মহারাষ্ট্রীয় গৌরবলক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন!

অনেকক্ষণ পর শিবজী মুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"পেশওয়াজী! আপনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জায়গীরদার হইয়া থাকিব? মহারাষ্ট্রীয় গৌরব-রবি চিরান্ধকারে মগ্ন হইবে?"

মুরেশ্বর। "মনুষ্যের যাহা সাধ্য আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে?"

পুনরায় সভাস্থ সকলে নীরব।

পুনরায় শিবজী বলিলেন—

"স্বর্ণদেব! যখন আপনি আমার আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রায়গড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজার রাজধানী স্বরূপ নির্ম্মাণ করেন, না সামান্য জায়গীরদারের আবাসস্থান বলিয়া নির্ম্মাণ করেন?"

আবাজী স্বর্ণদেব ক্ষুণ্ণস্বরে উত্তর করিলেন—

"ক্ষত্রিয়রাজ! ভবানীর আদেশে এক দিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয়। যখন রায়গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম তখন কে জানিত হিন্দুসেনাপতি জয়সিংহ সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইবেন? ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন।"

অন্নজী দত্ত কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বেই আমরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছি, সে বিষয় অদ্য পুনরুত্থাপন করিয়া আক্ষেপ করিলে ফল কি? যাহা অনিবার্য্য তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীগমনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিবেচনা করুন।"

শিবজী কহিলেন, "অন্নজী! আপনার কথা সত্য, কিন্তু যে আশা, যে উৎসাহ, যে চেষ্টা হৃদয়ে বহুকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না।" ক্ষণেক চিন্তার পর বলিলেন, "ঐ যে উন্নত পর্ব্বত-শ্রেণী চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বাল্য-সুহৃদ্ অন্নজী মালশ্রী! ঐ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বা উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে করিতে হৃদয়ে কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত তাহা কি স্মরণ হয়? পুনরায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন

হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্রের ন্যায় [illegible] ধরার অধিপতি হিমালয় হইতে সাগরকূল পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ শাসন করিবেন! ঈশানি! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নমাত্র তবে এরূপ স্বপ্নে কেন বালকের হৃদয় চঞ্চল করিয়াছিলে?”

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল; সকলে নীরব, সভায় শব্দমাত্র নাই,—সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈষৎ অন্ধকার স্থান হইতে একটী গম্ভীর-স্বর শ্রুত হইল, “ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না; রাজন্! তীক্ষ্ণহস্তে অসি ধারণ করুন, অধ্যবসায় সহিত এই উন্নত পথ অনুসরণ করুন,—স্বপ্ন এখনও সফল হইবে!”

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, জটাজূটধারী, বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ নবীন গোস্বামী সীতাপতি!

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন, “গোঁসাইজী! তুমি বাল্য-উৎসাহ আমার হৃদয়ে পুনরুদ্রেক করিতেছ,—বাল্য-কথা পুনরায় স্মরণ হইতেছে! তাত, দাদাজী কানাইদেব মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘বৎস! তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিতকারীকে শাস্তিপ্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।’ বিংশতি বৎসর পরে অদ্যাপি দাদাজীর গম্ভীরস্বর আমার কর্ণকুহরে শব্দিত হইতেছে,—দাদাজী কি প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন?”

পুনরায় সেই গোস্বামী সেই গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—“কানাইদেব প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে,—পথমধ্যে যদি আমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া উদ্দেশ্য হারাইয়া নিরস্ত হই, সে কি তাত দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা, না আমাদের ভীরুতা?”

“ভীরুতা” শব্দ উচ্চারণমাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল; বীরদিগের কোষে অসি ঝন্‌ঝনা শব্দ করিল,—ক্রোধী চন্দ্ররাও জুমলাদার গোস্বামীর গলদেশ সজোরে ধারণ করিলেন। সীতাপতি ধীর, ভয়শূন্য,—ধীরে ধীরে আপন বজ্রহস্তে চন্দ্ররাওয়ের হস্ত ছাড়াইয়া যেন পতঙ্গবৎ সেই জুমলাদারকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বিস্মিত হইয়া সকলে বুঝিলেন গোস্বামীর চিরজীবন কেবল যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হয় নাই!

গোস্বামী পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"রাজন্! গোস্বামীর বাচালতা ক্ষমা করুন, যদি অন্যায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি ক্ষমা করুন; কিন্তু মদীয় উপদেশ সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়-রাজ! আপন বীরহৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুন; যিনি জায়গীরদারের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে বহু বিপদ, বহু সঙ্কট হইতে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পর্ব্বতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন, সে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিবেন? বালসূর্য্যের ন্যায় যে হিন্দুরাজ্যের তেজ চারিদিকে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া উদয় হইতেছে,—সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত যাইবে? রাজন্! হিন্দু-গৌরব-লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন? আমি ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্র, আমার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।"

সভাস্থ সকলে নীরব—শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল!

অনেক ক্ষণ পরে শিবজী গোস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"স্বামিন্! আপনার সহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে,—আপনি দেব কি মনুষ্য জানি না, কিন্তু দৈববাণী হইতে আপনার কথা অধিক মিষ্ট, হৃদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি;—হিন্দু-সেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ণ রণকৌশল, অসংখ্য রাজপুত-সেনা, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে এরূপ সৈন্য আমাদের কোথায়?"

সীতাপতি। "রাজপুতগণ বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না, জয়সিংহ রণপণ্ডিত, কিন্তু শিবজীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই পরাজয় হয়। পুরুষ-সিংহ! বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া, দৈব সংহনন করিয়া, কার্য্যসাধন করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই যে আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনার সহায়তা না করিবেন!" সভাস্থল পুনঃস্তম্ভিত।

শিবজী। "মানিলাম, কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া রুধিরস্রোতে দেশ প্লাবিত করিবে, সে কি মঙ্গল, সে কি পুণ্যকর্ম্ম?"

সীতাপতি। "না—কিন্তু সে পাপে কে পাতকী? যিনি স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করেন, না যিনি মুসলমান অর্থভুক্ হইয়া স্বজাতির বৈরাচরণ করেন, তিনি?"

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন, প্রায় একদণ্ড কাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভীষণ চিন্তালহরীতে আলোড়িত হইতেছিল, কে বলিবে? এক দণ্ডকাল পর ধীরে ধীরে মস্তক উঠাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"সীতাপতি! অদ্য জানিলাম মহারাষ্ট্র দেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এখনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ হইবে,—সে যুদ্ধের দিনে আপনা অপেক্ষা বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছি না, স্বধর্ম্মী-নাশ আশঙ্কা করিতেছি না, অন্য একটী কারণে আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ করুন।

"যে মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াছি তাহা সাধনার্থ কত ষড়যন্ত্র, কত গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি, আপনার নিকট অগোচর নাই। কত হত্যা করিয়াছি, কত সন্ধিবাক্য বিস্মরণ হইয়াছি, কত গর্হিত কার্য্যে শিবজীর নাম কলুষিত রহিয়াছে! দেবদেব মহাদেব জানেন আপনার লাভের জন্য এ সমস্ত করি নাই,—হিন্দু-গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে, শিবজীর কেবল এই একমাত্র উদ্দেশ্য!

"অদ্য হিন্দু ধর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ, হিন্দু প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ মহারাজ জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি,—শিবজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপারক! বিধর্ম্মীর সহিত কপটাচারণ করিয়াছি,—ভগবান সে পাপ ক্ষমা করুন,—মহানুভব রাজপুতের সহিত কপটাচরণ শিবজী জীবন থাকিতে করিবে না।

"ধর্ম্মাত্মা এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্যলঙ্ঘনে হইবে!' সে কথা অদ্যাপি আমি বিস্মৃত হই নাই,—সে কথা অদ্য বিস্মরণ হইব না।

"সীতাপতি! আরংজীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী দুর্ব্বল হস্তে খড়্গ ধরিবে না। কিন্তু জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারক।"

সভাসদ্ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর অন্নজী বলিলেন—

"মহারাজ! আর একটী কথা আছে—আপনি কি দিল্লী যাওয়া স্থির করিয়াছেন?"

শিবজী। "সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাক্যদান করিয়াছি।

অন্নজী। "মহারাজ আরংজীবের চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবেন? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না?"

শিবজী। "অন্নজী! জয়সিংহ স্বয়ং বাক্যদান করিয়াছেন যে দিল্লীগমনে আমার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না।"

অন্নজী। "কপটাচারী আরংজীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন?"

শিবজী। "সন্ধি লঙ্ঘনের ফল তিনি অবশ্যই ভোগ করিবেন। দত্তজী! মহারাষ্ট্রভূমি বীরপ্রসবিনী, আরংজীব এরূপ আচরণ করিলে মহারাষ্ট্র দেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবে সাগরের জলে তাহা নিবারিত হইবে না, আরংজীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে! পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে!"

শিবজীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিষেধ করিলেন না। ক্ষণেক পর শিবজী বলিলেন—

"আর একটী কথা আছে, পেশওয়াজী মুরেশ্বর! আবাজী স্বর্ণদেব! অন্নজী দত্ত! আপনাদিগের ন্যায় প্রকৃত বন্ধু আমার অতি বিরল,—আপনাদিগের ন্যায় কার্য্যক্ষম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্রদেশে বিরল। আমার অবর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রদেশ আপনারা তিন জনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের ন্যায় সকলে পালন করিবে, এরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।"

মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন। অন্নজী মালশ্রী তখন বলিলেন, "ক্ষত্রিয়রাজ! আমার একটী আবেদন আছে। বাল্যকাল হইতে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অনুমতি করুন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।"

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন, "মালশ্রী! তোমার নিকট আমার অদেয় কিছুই নাই,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

সীতাপতি ক্ষণেক পর বলিলেন, "রাজন্! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমার ব্রতসাধনার্থ বহু তীর্থে যাইতে হইবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।"

শিবজী। "নবীন গোস্বামিন্! কুশলে তীর্থযাত্রা করুন! যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিব, আপনা অপেক্ষা প্রকৃত যোদ্ধা আমি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনার মত অল্প বয়সেই এরূপ তেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।"

পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অপরিস্ফুটস্বরে বলিলেন—"কেবল আর এক জনকে জানিতাম।"

সভা ভঙ্গ হইল। শিবজী শয়নাগারে যাইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, নবীন গোস্বামীর উৎসাহ-বাক্য বার বার মনে উদ্রেক হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর নিদ্রিত হইলেন, নিদ্রায়ও যেন সেই উৎসাহ-বাক্য শুনিতে লাগিলেন, সেই বীরভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বপ্নে সকল ঠিক দেখা যায় না, অবস্থা ও রূপের পরিবর্ত্তন হয়। শিবজী স্বপ্নে সেই উত্তেজনা-বাক্য শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু বক্তা যেন সে নবীন গোস্বামী নহে, বক্তা রঘুনাথজী হাবিলদার!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পৃথুরায়ের দুর্গ।

"চলেছে চাহিয়া দেখ,
যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।

* * * *

জন্মিবে পুরুষগণ
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া।"
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬৬৬ খৃঃ অব্দের বসন্তকালে পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক মাত্র লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে, শিবজী চিন্তিতমনে এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই? এইরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মহৎ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডল গম্ভীর, ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত,—বিপদকালে, যুদ্ধকালেও কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাঙ্কিত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার তেজস্বী উগ্রস্বভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন।

রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

দুই জনে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিতেছিলেন। শিবজীর হৃদয় ভীষণ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত ও উৎক্ষিপ্ত। অনেকক্ষণ পর তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ন্যায়শাস্ত্রী, আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন?"

রঘুনাথ। "বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।"

শিব। "তবে সম্মুখে ঐ বহুবিস্তীর্ণ প্রাচীরের ন্যায় কি দেখা যাইতেছে বলিতে পারেন? আপনি অনন্যমনা হইয়া ঐ দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কিজন্য?"

রঘুনাথ। "মহারাজ! ভারতবর্ষের শেষ হিন্দুরাজা পৃথুরায়ের দুর্গ-প্রাচীর দেখা যাইতেছে।"

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হায়! এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ! ঐই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল! এই স্থানে তিনি একবার ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হা! ন্যায়শাস্ত্রী!

"সেদিন ঐ প্রাচীরের প্রত্যেক স্তম্ভ হইতে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, ঐ মরুভূমিস্থলে প্রশস্ত নগর বিজয়বাদ্যে শব্দিত হইয়াছিল, সমরবিজয়ী হিন্দুসেনার কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইয়াছিল। সেদিন হিমালয় হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দুবীরগণ সবলহস্তে স্বাধীনতা রক্ষা করিত,—হিন্দুললনাগণ উল্লাসে স্বাধীনতা গান গাইত! কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় সে দিন গত হইয়াছে, ঐ পুরাতন দুর্গের নিকট পৃথুরায় অন্যায় সমরে হত হইলেন, পুণ্য ভারতস্থান অন্ধকারে আবৃত হইল! দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুসুম বসন্তে আবার দেখা যায়, ভারতের গৌরবদিন কি আর দেখা দিবে না? এক দিন ভরসা করিয়াছিলাম, সেই গৌরবের দিন আবার আসিবে, সে আশা কি ফলবতী হইবে?"

শিবজী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয় চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব! যে দিন যবনগণ জয়লাভ করিল, সে দিন

তোমার হস্তে প্রচণ্ড ত্রিশূল নিশ্চেষ্ট বা নিদ্রিত ছিল! সংহারক! কেন ধর্ম্মবিনাশিদিগকে সংহার করিলে না?"

রঘুনাথ। "কে বলিবে, কেন? যাঁহারা হিন্দুরাজ্য বিনাশ করিলেন, তাঁহারা হিন্দু-দেবমণ্ডলীরও অবমাননা করিতে ক্রুটী করেন নাই;—সেই ভীষণপাতকের প্রমাণ অক্ষয় প্রস্তরে খোদিত আছে, সে পাপের প্রতিশোধ এখনও হয় নাই!"

কম্পিতস্বরে শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন্যায়শাস্ত্রী! আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কোথায় সে প্রমাণ খোদিত আছে?"

রঘুনাথ "সন্নিকটে" এই বলিয়া অনতিদূরে একটী পুরাতন প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবমন্দিরে শিবজীকে লইয়া গেলেন, বলিলেন, "চারিদিক্ অবলোকন করুন।"

শিবজী। "দেখিতেছি, মধ্যে প্রাঙ্গণ, চারিদিকে সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভসার! একটী সুন্দর দেবমন্দির ছিল,—কালে ভগ্ন হইয়াছে। দেবের অবমাননা-চিহ্ন কোথায় খোদিত আছে?"

রঘুনাথ। "তীক্ষ্ণদৃষ্টি করুন, এই সুন্দর স্তম্ভসারের একটী স্তম্ভও ভগ্ন হয় নাই,—তাহার উপর অঙ্কিত দেবমূর্ত্তিগুলিও ভগ্ন হয় নাই, কিন্তু নিরীক্ষণ করুন, একটী মূর্ত্তিরও মুখমণ্ডল দৃষ্ট হইবে না! কালে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিত, ধর্ম্ম-বিদ্বেষী যবনেরা স্তম্ভগুলি রাখিয়াছে; কিন্তু সহস্র দেবমূর্ত্তির মধ্যে প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখমণ্ডল মাত্র স্বহস্তে ভগ্ন করিয়াছে! বাসনা, যে দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া চিরকাল দেখিতে পাইবে, যবনগণ হিন্দুদেবের অবমাননা করিয়াছেন,—যত দিন এই অক্ষয় স্তম্ভসার থাকিবে, তত দিন জগতে হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা ঘোষণা করিবে!

"অদ্যাপি সেই পুরাতন মন্দিরের সুন্দর স্তম্ভসার বিদ্যমান রহিয়াছে, অদ্যাপি প্রতিস্তম্ভে বহু দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে,—প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখমণ্ডল বিকৃত বা ভগ্ন, প্রথম মুসলমান আক্রমণকারিদিগের ভীষণ ধর্ম্মবিদ্বেষের পরিচয় দিতেছে!"

শিবজীর স্বভাবতই হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় ভক্তি ছিল, এই স্তম্ভসার দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী আরও বলিতে লাগিলেন—

"এদিকে হিন্দুর অবমাননা, অন্যদিকে যবনের গৌরব! এই যে সম্মুখে উন্নত স্তম্ভ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, এটা কুতবমিনার, কুতব-উদ্দীনের বিজয়, হিন্দুদিগের পরাজয় জগন্মণ্ডলে ঘোষণা করিতেছে! এই

দেখুন আল্‌টমশ্ প্রভৃতি যবন রাজাদিগের গোরস্থানের উপর কিরূপ উন্নত সুন্দর প্রস্তরহর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে; এই একটী মসজীদ্ প্রস্তুত হইতেছিল, ঐ পুরাতন হিন্দু-দেবালয় ভগ্ন হইয়া উহারই প্রস্তরদ্বারা মসজীদ্ উঠিতেছিল! সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ! সকল স্থানে পরাভূত হিন্দুদিগের গৌরবচিহ্ন একে একে বিলীন হইতেছে, তাহার উপর বিজয়ী যবনের গৌরবস্তম্ভ উত্থিত হইতেছে। এই কুতবমিনারের উপর আরোহণ করুন; মসজীদের পরে মসজীদ, গোরস্থানের পরে গোরস্থান,—দূরে দিল্লীর অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলী লক্ষিত হইবে, কিন্তু পুরাকালের হস্তিনাপুর ইন্দ্রপুরীতুল্য ইন্দ্রপ্রস্থ বিলীন হইয়াছে,—তাহার একটী স্তম্ভ বা একটী মন্দিরও নয়নগোচর হইবে না।"

নিঃশব্দে শিবজী ও শম্ভুজী ও রঘুনাথপন্ত কুতবমিনারের উপর উঠিলেন,—সেরূপ উন্নত স্তম্ভ বোধ হয় জগতে আর নাই। নিঃশব্দে পূর্ণহৃদয়ে শিবজী চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন;—এই স্থানে কি জগদ্বিখ্যাত হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, এস্থানে কি প্রাতঃস্মরণীয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃসহ বাস করিয়াছিলেন,—এস্থানে কি সেই পুণ্যকালে সেই পুণ্যলোক রাজত্ব করিয়া সসাগরা ধরায় আর্য্য-গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস কি এই স্থানে অধিবাস করিতেন? ভীষ্মাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুন, ভারতের অতুল বীরবৃন্দ কি ইহারই নিকট আপন আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া অক্ষয় যশোলাভ করিয়াছেন,—কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া ললনাগণ কি এই স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন?—শিবজীর বাক্‌শক্তি রোধ হইল, দুই নয়ন দিয়া জল বহিতে লাগিল,—গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিলেন,—

"দেবতুল্য পূর্ব্বপুরুষগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি। আমাদের বাহু বলশূন্য, আমাদের নয়ন তিমিরাবৃত, আমাদের হৃদয় ক্ষীণ! ঐ নীল নভোমণ্ডল হইতে প্রসন্ন হইয়া আলোক দান করুন,—বল দান করুন,—যেন হিন্দুনাম পুনর্ব্বার উন্নত করিতে পারি,—নচেৎ সেই উদ্যমেই যেন মৃত্যু হয়! এ জীবনে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই!"

শম্ভুজীর হৃদয়ও পূর্ণ হইল, তাঁহারও নয়ন হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শিবজী চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন, ছয় শত বৎসরাবধি মুসলমানগণ রাজ্য করিয়াছেন, তাহার চিহ্ন যেন সেইস্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে! অসংখ্য মস্‌জীদ্, অসংখ্য মুসলমান সম্রাটের গোরস্থান, অথবা অসংখ্য ভগ্ন ও চূর্ণ প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ সেই কুতব্‌মিনার হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত

ছয় ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া দেখা যাইতেছে। করালকাল হিন্দু ও যবনের মধ্যে বিভিন্নতা জানে না,—শত শত বৎসরে সহস্র সহস্র মানবকীটে যে সমস্ত হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করে, হেলায় ভূমিসাৎ করিয়া যায়।

সেদিক্ হইতে নয়ন ফিরাইয়া শিবজী পুনরায় সেই পৃথুর দুর্গপ্রাচীরের দিকে দেখিলেন, অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রঘুনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—

"ন্যায়শাস্ত্রী! বাল্যকালে কঙ্কণপ্রদেশের কথা শুনিতাম, পৃথুরায়ের বিষয় যে যে কথা শুনিতাম, অদ্য যেন তাহা নয়নে দেখিতেছি। বোধ হইতেছে যেন ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ,—বহুজনাকীর্ণ, পতাকা ও তোরণশোভিত একটী বিস্তীর্ণ নগর! যেন রাজসভায় পাত্রমিত্রবেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন,—বাহিরে যতদূর দেখা যায়,—পথে ঘাটে, বাটীতে, প্রাঙ্গণে, নদীতীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে! যেন বহুবিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে,—উদ্যানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরোবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদসম্মুখে সেনাগণ সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; অশ্ব, হস্তী, রথ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বাদ্যকর সানন্দে বাদ্য করিতেছে! যেন প্রভাতের সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন,—যেন এমত সময়ে মহম্মদ ঘোরের দূত রাজসভায় প্রবেশ করিল।

"অন্যান্য কথার পর দূত বলিল, 'মহারাজ! মহম্মদ-ঘোর আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন তাহাতে আপনার কি মত?'

"মহানুভব চোহান্ উত্তর করিলেন—

"'যবে সূর্য্যদেব আকাশে অন্য একটী সূর্য্যকে স্থান দিবেন, পৃথুরায় সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থান দিবেন!' রাজবাক্যশ্রবণে জয় জয়নাদে সেই প্রশস্তপ্রাসাদ শব্দিত হইল,—জয় জয়নাদে প্রশস্ত নগর শব্দিত হইল!

"দূত পুনরায় বলিল, 'মহারাজ! আপনার শ্বশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরের সহিত সন্ধি করিয়াছেন,—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন।'

"পৃথুরায় উত্তর করিলেন, 'শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম জানাইবেন ও বলিবেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছি,—অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব!'

"অবিলম্বে চোহান সৈন্য ঐ প্রশস্ত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল,—তেরৌরীর যুদ্ধে যবন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখে বায়ুতাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল,—আহত ঘোরী কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।"

ক্ষণেক পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"রঘুনাথ! সেদিন আমাদের গিয়াছে; কিন্তু তথাপি এস্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্মরণ করিলে স্বপ্নের ন্যায় নব নব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না; ভারতের পূর্ব্বদিন এখনও উদিত হইতে পারে। জগদীশ্বর রুগ্নকে আরোগ্যদান করেন, দুর্ব্বলকে বলদান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারতসন্তানকে তিনিই উন্নত করিতে পারেন।"

নিঃশব্দে সকলে কুতবমিনার হইতে অবতীর্ণ হইলেন; নিঃশব্দে শিবিরাভিমুখে যাইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামসিংহ।

"বাপের সদৃশ বীর, সমান সমান।"
কাশীরাম দাস।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন, এমত সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল—

"মহারাজ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অন্য একজন সৈনিক সহিত সম্রাট-আদেশে মহারাজকে দিল্লীতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন। উভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।"

শিব। "সাদরে লইয়া আইস।"

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন, "পিতঃ! আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন? এ অবমাননা সহ্য করিবেন?"

শিবজীও এই আরংজীবকৃত অবমাননায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ক্ষণেক পরই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত যুবক পিতার ন্যায় তেজস্বী ও বীর, পিতার

ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী যুবকের মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লীপ্রবেশে বিপদ্ আছে কি না, কথাচ্ছলে জানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীর্য্য ও প্রতাপের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন, সবিস্ময়নয়নে মহারাষ্ট্র বীরপুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন। ক্ষণেক পর রামসিংহ কহিলেন—

"মহারাজকে পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু পিতার নিকট আপনার যশোবার্ত্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অদ্য আপনার ন্যায় স্বদেশপ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।"

শিব। "আমারও অদ্য পরম সৌভাগ্য। আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজস্থানেও বিরল, দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।"

রাম। "মহাশয়! দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সম্রাট্ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন্ নগর প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন?"

শিব। "প্রবেশসম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?" শিবজী তীক্ষ্ণনয়নে রামসিংহের দিকে চাহিতেছিলেন।

অকপটস্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন—

"আমার বিবেচনায় এইক্ষণই প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম দুঃসহনীয় হইবে।"

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকট কোনও সংবাদ অবিদিত নাই, আমার পক্ষে দিল্লীপ্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।"

উদারচেতা রামসিংহ এতক্ষণ পর শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"ক্ষমা করুন, আমি আপনার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি আপনার অবস্থায় হইলে চিরকাল পর্ব্বতে বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি অজ্ঞমাত্র,—পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন,

তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার পরামর্শ কখনও ব্যর্থ হয় না।”

শিবজী বুঝিলেন, দিল্লীতে তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে, রামসিংহ তাহা জানেন না। তখন পুনরায় বলিলেন—

“হাঁ! আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন,—আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্যদান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আপনি অবগত আছেন।”

রামসিংহ। “আছি, দিল্লী আগমনে আপনার কোনও বিপদ হইবে না, কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি আমাকেও আদেশ করিয়াছেন।”

শিব। “তাহাতে আপনার কি মত?”

রাম। “পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়, রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন হয় না,—পিতার বাক্য যাহাতে লঙ্ঘন না হয়, আপনি নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারেন, সে বিষয়ে দাসের যত্নের কোনও ত্রুটী হইবে না।”

শিবজীর মন নিরুদ্বেগ হইল। আর সন্দেহ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

“তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব; বিলম্ব করিলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, চলুন এইক্ষণই দিল্লী প্রবেশ করি।”

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট আপনাদিগের রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সম্রাট্‌দিগের মস্‌জীদ, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট সেই স্থানে দৃষ্ট হয়। কালক্রমে নূতন নূতন সম্রাট্ আরও উত্তরে নূতন নূতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল! শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ, কত মসজীদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন তাহা গণনা করিতে পারিলেন না। রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে অচিরে সৌহৃদ্য জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ্ হয়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পথিমধ্যে লোদীবংশীয় সম্রাট্‌দিগের প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক রাজার কবরের উপর এক একটী গম্বুজ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। আফ্‌গানদিগের গৌরব-সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন ঐই স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর হুমাউনের প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির। তাহার পরে "চৌষট্‌ খাম্বা," অর্থাৎ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত চতুঃষষ্টি স্তম্ভযুক্ত প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান। পৃথুরায়ের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এক একটী প্রাসাদ বা অট্টালিকা সেই ইতিহাসের এক একটী পত্র, এক একটী গোরস্থান এক একটী অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাসলেখক; নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকটে আসিলে রামসিংহ সগর্ব্বে একটী মন্দির দেখাইয়া বলিলেন—

"রাজন্‌, ঐ যে মন্দির দেখিতেছেন,—পিতা জ্যোতিষ গণনার্থ ঐ মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন; বহুদেশের পণ্ডিতেরা ঐ মন্দিরে আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।"

শিব। "আপনার পিতা যেরূপ বীর সেইরূপ বিজ্ঞ, জগতে এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন লোক অতি বিরল; শুনিয়াছি পুণ্য কাশীধামেও তিনি ঐরূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"

রাম। "যাহা আজ্ঞা করিলেন সত্য।" অচিরে দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর সকলে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর ঈষৎ হৃদ্‌কম্প হইল,—তিনি অশ্ব থামাইলেন। একবার পশ্চাৎদিকে চাহিলেন, একবার মনে চিন্তা উদয় হইল যে, "এখনও স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারি।" তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মপরায়ণ জয়সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন,—ভবানীর নাম লইলেন ও নিজ কোষে "ভবানী" নামক অসিকে মনে মনে স্মরণ করিয়া দিল্লীদ্বার প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্ত্তে বন্দী হইলেন!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীনগর।

"ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; * * *
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফলফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতী;
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে।"

মধুসূদন দত্ত।

দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে! আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন না; কিন্তু রাজকার্য্য সাধনার্থ সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অদ্য শিবজী দরিদ্র মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আসিয়াছেন; মোগলদিগের ক্ষমতা, সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী উৎসবের দিনে কুল-ললনার ন্যায় অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে!

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে! বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য রাশি করিয়া রাখিয়াছে; উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব্ব খাদ্যসামগ্রী, অপর্য্যাপ্ত গৃহানুকরণদ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের উপর দিয়া নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদে গৃহস্থেরা বারন্দায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব; রাজা, মনসবদার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ গমনাগমন করিতেছেন; অশ্বারোহীগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুণ্ড নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে; হুঙ্কার শব্দে শিবিকাবাহকগণ যেন আরোহীর পদমর্য্যাদা চীৎকারশব্দের

দ্বারা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে! শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়! যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটী শ্বেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন—

"ঐ দেখুন জুম্মা মস্‌জীদ্! সম্রাট শাহজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,—শুনিয়াছি ওরূপ মস্‌জীদ্ জগতে আর নাই।" শিবজী বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া মস্‌জীদের প্রাচীর দেখা যাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত তিনটী গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

এই অপরূপ মস্‌জীদের সম্মুখেই রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা·নদী, সম্মুখে দুর্গ ও মস্‌জীদের মধ্যে বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য! সেই স্থানের ন্যায় আর একটী স্থান ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না, সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর সহস্র নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে! দুর্গদ্বারে একজন প্রধান মনুসবদারের প্রশস্ত শিবির; মনুসবদার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের কিরিচশ্রেণী সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, প্রত্যেক কিরিচ হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমার্গে উড়িতেছে। দুর্গসম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গপ্রাচীর হইতে মস্‌জীদ-প্রাচীর পর্য্যন্ত ও উত্তর দক্ষিণে যতদূর পথ দেখা যায়, সমস্ত শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য! অশ্বারোহী, গজারোহী বা শিবিকারোহী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষ বহুলোকসমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্ব্বদাই দুর্গদ্বার ভিতর বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-শোভায় নয়ন ঝলসিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে! সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে শিবিরের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে ও রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবার্ত্তা জগৎসংসারে প্রচার করিতেছে!

বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ক্ষণেক এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গপ্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ "কারখানায়" অসংখ্য শিল্পকারগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ

দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে,—অপূর্ব্ব সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র, মল্‌মল্‌ মসলিন বা ছিট,—বহুমূল্য গালিচা, চন্দ্রাতপ, তাম্বু বা পরদা, সুন্দর পরিধেয়, উষ্ণীষ, শাল বা গাত্রাভরণ, অপরূপ সুবর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্যের বেগম-পরিধেয় অলঙ্কার, সুন্দর চিত্র, সুন্দর কারুকার্য্য, সুন্দর কাষ্ঠ বা শ্বেত প্রস্তরের গৃহানুকরণ দ্রব্য, রাশি রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনাদ্রব্য, কত বর্ণনা করিব! ভারতবর্ষে যত অপূর্ব্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আদেশে তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। সম্রাট্ রাজকার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাসিনী বেগমগণ যতরূপ অপূর্ব্ব "ফরমায়েশ" করিতেন, প্রাসাদবাসিদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, সমস্ত এই স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া "দেওয়ান আম" নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট্ সচরাচর এই স্থানেই সভা অধিবেশন করেন,—কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার জন্যই,—আরও ভিতরে সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত জগতে অতুল্য "দেওয়ান খাস" নামক প্রাসাদে সভা অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইলেন, দেখিলেন প্রাসাদের ভিতর রত্নমাণিক্য-বিনির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মিপ্রতিঘাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সম্রাট্ আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন, সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্য-বিনির্ম্মিত রেল, তাহার সম্মুখে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মনসবদার, ওমরাহ ও বীরপুরুষ এবং অসংখ্য লোক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রামসিংহ শিবজীর পরিচয় দান করিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অদ্য দিল্লীনগরের অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিষয় আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। যিনি বিংশতি বৎসর তুমুল যুদ্ধ করিয়া আপনার ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সম্প্রতি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, যিনি এতদূর স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সম্রাট্‌কে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সম্রাট্ তাঁহাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন? সামান্য সেনাপতিকেও ইহা অপেক্ষা সম্মান করিতেন, শিবজী অদ্য একজন সামান্য কর্ম্মচারীর [illegible] নম্রভাবে রাজসদনে দণ্ডায়মান! শিবজীর ধমনীতে উষ্ণ শোণিত

বহিতে লাগিল,—কিন্তু এক্ষণে নিরুপায়! সামান্য রাজকর্ম্মচারীর ন্যায় সম্রাট্‌কে "তসলীম" করিয়া রীতিমত "নজর" দান করিলেন। আরংজীবের দূর উদ্দেশ্য সাধন হইল,—জগৎ-সংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, ক্ষীণের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূর্খতা!

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আরংজীব "নজর" গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ সমাদর না করিয়া শিবজীকে "পাঁচ হাজারী" অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদিগের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিলেন, অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "শিবজী পাঁচ হাজারী? সম্রাট্ যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন শিবজীর অধীনে কত পাঁচ হাজারী আছে! দেখিবেন, তাহারা দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করে না!" শিবজীর পার্শ্বস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ এই কথা শুনিতে পাইল, সম্রাটের কাণে এ কথা উঠিল।

অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন হইলে সভাভঙ্গ হইল। সম্রাট্ গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত বেগমমহলে গেলেন; নদীর স্রোতের ন্যায় দুর্গ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত নির্গত হইতে লাগিল, যে যাহার আবাসস্থানে যাইল, সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ দিল্লীনগরে অচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটী বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; রোষে, অভিমানে. সন্ধ্যার সময় শিবজী সেই বাটীতে আসিলেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল, যে অদ্য সম্রাটের সম্মুখে শিবজী যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সম্রাট্ তাহা শুনিয়াছেন, সম্রাট্ শিবজীকে অন্য দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে; ব্যাধে যেরূপ সিংহকে ধরিবার জন্য জাল পাতে, ক্রূর দুষ্টবুদ্ধি আরংজীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন! "এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিব?" পুনরায় নীরবে প্রা একদণ্ডকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হা সীতাপতি গোস্বামিন্! মিত্রবর! চিরযুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়াছিলে,—তখন তোমার পরামর্শ

গ্রাহ্য করিলাম না, তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে!—আরংজীব! সাবধান! শিবজী এ পর্য্যন্ত তোমার নিকট সত্য-পালন করিয়াছে,—তাহার সহিত অসত্য বা খল আচরণ করিও না, কেননা শিবজীও সে বিদ্যার শিশু নহেন। যদি কর, ভবানী সাক্ষী থাকুন, মহারাষ্ট্রদেশে যে সমরানল প্রজ্জলিত করিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া যাইবে!"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশীথে আগন্তুক।

"কে তুমি——————
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ।"

মধুসূদন দত্ত।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য! শিবজী সম্রাটের এই কপটাচরণে যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী সর্ব্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন।

অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে, প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়,—অনুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

ন্যায়শাস্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর ও বাক্‌পটুতায় অগ্রগণ্য, তিনি শিবজীর আবেদন রাজ-সদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

আবেদনপত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল। শিবজী মোগল সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অঙ্গীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে [illegible]। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে, "আমি যে কার্য্য

সাধন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ-রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে যতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট্ আমার সহায়তা গ্রহণ না করেন, অনুমতি দিন আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি, কেননা হিন্দুস্থানের জলবায়ু আমার পক্ষে ও আমার সঙ্গী ও সেনার পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।" রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদনপত্র সম্রাট-সদনে উপস্থিত করিলেন, সম্রাট্ উত্তর পাঠাইলেন, উত্তরে নানা কথা লিখা আছে, কিন্তু শিবজীর প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি নাই! শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক দিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্য্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে! দিল্লী অসংখ্য সৈনিকের বাসস্থান, সর্ব্বদাই প্রশস্ত পথ দিয়া দুই এক জন সৈনিক যাইতে দেখা যাইতেছে। কখন কখন দুই এক জন শ্বেতাঙ্গ মোগল সদর্পে যাইতেছেন, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, দুই এক জন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে। পারস্য, আরব, তাতার ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক বা মসাফের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি রাজা বা মনসবদার বহুলোকসমন্বিত হইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকার আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, তদপেক্ষা উচ্চরবে বিক্রেতাগণ আপন আপন পণ্যদ্রব্য মস্তকে লইয়া চীৎকার করিতেছে, এতদ্ভিন্ন সহস্র অন্যান্য লোক সহস্র কার্য্যে জলের স্রোতের ন্যায় যাতায়াত করিতেছে!

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত কলরব যেন ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইল, দুই একটী বাটীর গবাক্ষভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল, অনন্ত হর্ম্ম্যশ্রেণীর মধ্যে দূরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটী তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমাচ্ছটা আর নাই, শিবজী পূর্ব্বদিকে চাহিলেন, দিল্লীর

উন্নত প্রাচীর, তাহার পর শান্ত বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রবাহিণী যমুনানদী সায়ংকালের নিস্তব্ধতায় অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে!

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জুম্মা মস্‌জীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উত্থিত হইল, যেন সে গম্ভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! শিবজী মুসলমান-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও স্তব্ধ হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূর-উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মস্‌জীদের শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত গম্বুজ সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল প্রাসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর যেন দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে! এতদ্ভিন্ন সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিস্তব্ধতায় স্তব্ধ!

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না। অদ্য পূর্ব্বকথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। বাল্যকালের সুহৃদ্বর্গ, বাল্যকালের আশা, ভরসা, উদ্যম;—সাহসী উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্যসুহৃদ্ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী!—যিনি মহারাষ্ট্রের জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, যিনি বীরমাতার ন্যায় বালককে বীরকার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন, বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন!

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, ভীষণ কার্য্যপরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ্, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব্ব জয়লাভ, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ! বিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিলেন, প্রতিবৎসর অপূর্ব্ব বিজয়ে বা অসমসাহসী কার্য্যে অঙ্কিত ও সমুজ্জ্বল!

সে কার্য্যপরম্পরা কি ব্যর্থ? সে আশা কি মায়াবিনী?—না এখনও ভবিষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে যবন-রাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তির মস্তকের উপর রাজচ্ছত্র উন্মীলিত হইবে?

এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে দ্বিপ্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল, রাজপ্রাসাদের নাগ্‌রাখানা হইতে সে শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর ব্যাপ্ত হইল, নৈশ নিস্তব্ধতার গম্ভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল।

আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটী দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আকাশপটে যেন দীর্ঘ-নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি।

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রূযুগলের উপর হইতে নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণনয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাজূট, শরীরে বিভূতি; হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা বা কোনও প্রকার অস্ত্র নাই;— তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট-প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ণনয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতরও শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন—

"মহারাজের জয় হউক!"

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল; বিপদের সময়, চিন্তার সময় এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামীকে প্রণাম ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটী দীপ জ্বালিলেন, পরে অতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বন্ধুপ্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন, ও অদ্য নিশীথে সহসা গবাক্ষদ্বার দিয়া আসিবারই বা অর্থ কি?"

সীতাপতি উত্তর করিলেন, "মহারাজ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল; আপনি যে সচীবপ্রবরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেননা আপনি রায়গড় পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার কঠোর ব্রতসাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে হয়,—সেই প্রয়োজনেই মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি, নিশাই কি?"

শিব। "তথাপি কোনও বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয়া দ্বিপ্রহর নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ প্রকাশ করিয়া বলুন।'

সীতা। "নিবেদন করিতেছি; কিন্তু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন ?"

শিব। "শারীরিক কুশলে আছি,—শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায় ?"

সীতা। "প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধিই আছে, আপনার শত্রু কোথায় ?"

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সর্পের সহিত ভেকের সহিত সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী ? সীতাপতি! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার বীরোপযোগী পরামর্শ শুনিতাম তাহা হইলে কঙ্কণদেশের ভীষণ পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের জন্য অদ্যাপিও যুদ্ধ করিতে পারিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া থানার মধ্যে পড়িতাম না,—দিল্লীনগরে বন্দী হইতাম না।"

সীতা। "প্রভু আত্মতিরস্কার করিবেন না, মনুষ্যমাত্রই ভ্রান্তির অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষমাত্র নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সদাচরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক এস্থানে আসিয়াছেন, যিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহার সমুচিত দণ্ড দিবেন। প্রভু! খলতার জয় নাই,—অদ্য আরঞ্জীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিবার আশা করিয়াছেন, সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন। মহারাজ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে সে কথা এখনও কেহ বিস্মরণ হয় নাই;—আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন, তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে।"

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন—

"সীতাপতি! সে ভরসা এখনও লোপ হয় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন মহারাষ্ট্রজীবন লোপ পায় নাই! কিন্তু হায়! যে সময়ে আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্যেরা মোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দীস্বরূপ থাকিব ?"

সীতা। "যবে গগনসঞ্চারী বায়ুকে আরংজীব জালদ্বারা রুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন আপনাকে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে!"

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তবে বোধ করি, আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন!"

সীতা। "প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এরূপ সম্ভাবনা নাই।"

শিব। "সে উপায় কি?"

সীতা। "অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্ব্বদিকে একস্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয় বীরের অসাধ্য নহে। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে অষ্টজন বাহক আছে, নিমেষমধ্যে মথুরায় পঁহুছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছে, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।"

শিব। "আমি আপনার উদ্যোগে যথেষ্ট বাধিত হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু তাহার আর একটী নিদর্শন পাইলাম। কিন্তু মনে করুন প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় কেহ আমাকে দেখিতে পাইল, তখন পলায়ন দুঃসাধ্য,—আরংজীবহস্তে নিশ্চয় মৃত্যু।"

সীতা। "প্রাচীরের যেস্থানে লৌহশলাকা দেওয়া আছে তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশ জন খড়্গহস্তে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।"

শিব। "ভাল, নৌকায় গমনকালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ-প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?"

সীতা। "অষ্টজন নৌকাবাহক ছদ্মবেশী আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তূণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে তাহার সম্ভাবনা নাই।"

শিব। "মথুরায় পঁহুছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?"

সীতা। "আপনার পেশওয়ার ভগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত তাহা আপনিই জানেন। আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন।"

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—

"আপনি পাঠ করিয়া শুনান্।" সীতাপতি লজ্জিত হইলেন, তাঁহার তখন স্মরণ হইল যে শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না, কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই!

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন, পত্রে বিস্তীর্ণ লিখা আছে; শুনিয়া শিবজী বলিলেন—

“গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে কখনই বোধ হয় না, শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনার অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না! কিন্তু এখনও একটী কথা আছে; আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত, প্রিয়সুহৃদ্ অন্নজী মালশ্রী, আমার সেনাগণ কোথায় থাকিবে? ইহারা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?”

সীতা। “আপনার পুত্র, প্রিয়সুহৃদ্ ও মন্ত্রীবর আপনার সহিত অদ্য রজনীতেই যাইতে পারে;—আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই,—আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।”

শিব। “সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না; তিনি ভ্রাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।”

সীতা। “যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাষ্ট্র এরূপ ভীরু যে আপনার নিরাপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিতপ্রাণ বিসর্জ্জন না করিবে?”

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন; পরে মহানুভব ধীরে ধীরে বলিলেন—

“গোস্বামিন্! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাধিত রহিলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না; এরূপ ভীরুতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন!”

সীতা। “অন্য উপায় নাই!”

শিব। “তবে সময় দিন্, শিবজীর এই প্রথম বিপদ্ নহে, উপায় উদ্ভাবনে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।”

সীতা। “সময় নাই! অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন; নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ!”

শিব। “আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন জানি না, কিন্তু আপনার গণনা যদি যথার্থও হয়, তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই;—

শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে!”

সীতা। “প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আরংজীবকে শাস্তিদান করুন,—সেই দূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন, অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে।”

শিব। “সীতাপতি! যিনি জগতের রাজা তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন? আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।”

সীতা। “প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন; কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না,—কল্য আপনি বন্দী!”

শিব। “তাহাই হউক;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর প্রতিজ্ঞা অবিচলিত!”

সীতা। “তবে আদেশ দিন্, আমি বিদায় হই।” অতিশয় ক্ষীণ দুঃখের স্বরে সীতাপতি এই কথাগুলি বলিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার নয়নে জলবিন্দু।

তখন সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন—“গোস্বামিন্! দোষ গ্রহণ করিবেন না; আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না; রায়গড়ে আপনার বীরপরামর্শ, দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে জাগরিত থাকিবে! বিদায় কিজন্য? যতদিন দিল্লীতে থাকিবেন, আমার এই অট্টালিকায় থাকুন, এস্থানে আমার বিপদ আছে, আপনার নাই।”

সীতা। “প্রভু! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম; জগদীশ্বর জানেন আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলাষ নাই; কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রতসাধনের জন্য নানাস্থানে নানা কার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।”

শিব। “এ কি অসাধারণ ব্রত জানি না; কিন্তু দিবসে একদিনও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না; রজনীযোগে অন্ধকারে এইরূপ রক্তচন্দনাবৃত হইয়া জটাধারণ করিয়া এক একবার দেখা দেন, দুই একটী বাক্যে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত করেন, পুনরায় কোথায় চলিয়া

যান আর দেখিতে পাই না! সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রতধারণ করিয়াছেন?”

সীতা। “সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটী অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ!”

শিব। “ভাল, এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?”

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন—“আমার ললাটে একটী অমঙ্গল লিখন আছে,—আমার ইষ্টদেবতা, যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ করিয়া জীবন দিতে আমি আনন্দ বোধ করিব, বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট! সেই অসন্তোষ খণ্ডনার্থ এই ব্রতধারণ করিয়াছি।”

শিব। “এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কে বা আপনাকে অমঙ্গল খণ্ডনার্থ এ ব্রত ধারণ করিতে বলিল?”

সীতা। “কার্য্যবশতঃ আমি স্বয়ংই প্রথমটী জানিতে পারিলাম; ঈশানী-মন্দিরে একজন সতী সাধ্বী যোগিনী আমাকে এই ব্রতধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, তবে সে ভগিনীসম স্নেহময়ীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব; যদি কৃতার্থ না হই, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার সন্তোষার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি অসন্তুষ্ট থাকিলে এ জীবনে আবশ্যক কি?”

শিবজী দেখিলেন, গোস্বামীর নয়নে জলবিন্দু,—তাঁহার নিজের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না; বলিলেন—

“সীতাপতি! যাহা বলিলেন যথার্থ; যাহার জন্য প্রাণপণ করি, তাঁহার তিরস্কার, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।”

সীতা। “প্রভু! কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন?”

শিব। “জগদীশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একজন নির্দ্দোষী বীরপুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি;—সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।”

প্রায় উদ্বেগরুদ্ধকণ্ঠে সীতাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাঁহার নাম কি?”

শিবজী বলিলেন, “রঘুনাথজী হাবেলদার!”

ঘরের দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল।

শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অতি কষ্টোচ্চারিতস্বরে সীতাপতি বলিলেন, “দীপ অনাবশ্যক,—বলুন,—শ্রবণ করিতেছি!”

শিব। "আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে সেই বালকবেশী বীরপুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার; সীতাপতি! আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প; আপনার ন্যায় বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায়ই দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব ও অকুতোভয়তা সর্ব্বদা বিরাজ করিত! আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি,—আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়!"

"তাহার পর?"

"সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখিলাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম; সেই দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম;—রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্ব্বদা আমার ছায়ার ন্যায় নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুরেখা ভেদ করিয়া, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া, সিংহনাদে অগ্রসর হইত! এখনও বোধ হয় তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন আমি দেখিতে পাইতেছি?"

"তাহার পর?"

"এক যুদ্ধে আমার জীবনরক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গজয় হইয়াছিল, কত যুদ্ধে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল!"

"তাহার পর?"

"আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য; আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম; শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটীও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই; যাইবার সময়ও আমার দিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।" শিবজীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না; অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন—

"আক্ষেপের কারণ কি? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম।"

শিব। "দোষী! রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি ক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব

হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম। মহানুভব জয়সিংহ পরে এবিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,—জানিয়াছেন যে তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধপূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেইজন্যই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দ্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণবিনাশ করিয়াছি।"

শিবজীর কথা সাঙ্গ হইল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন—"সীতাপতি!"

কোনও উত্তর পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন,—সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই! সীতাপতি গোস্বামী সহসা অদৃশ্য হইলেন কি জন্য? সীতাপতি গোস্বামী কে?

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

আরংজীব।

"আপনি কাটারি মারি আপনার পায়।
অহঙ্কার ক'রে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায়॥
বুদ্ধিমান হ'য়ে জ্ঞান হারালি হতভাগা।
শিরে কৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধ্‌বি তাগা॥

* * * *

সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমূর্খ।
ব'ল্লে কথা বুঝিস্‌ নাহি এই বড় দুঃখ॥"

কীর্ত্তিবাস ওঝা।

পরদিন প্রায় এক প্রহর বেলার সময় শিবজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, জাগরিত হইয়াই রাজপথে একটী গোলযোগ শুনিলেন, উঠিয়া গবাক্ষ দিয়া নিম্নদিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন,—

দেখিলেন বাটীর পশ্চাতে, দুই পার্শ্বে, সম্মুখদ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বিশেষ পরিচয় না পাইলে বাহিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে যাইতে দিতেছে না।

দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ হইল, কল্য তিনি পলাইতে পারিতেন, অদ্য আরংজীবের বন্দী !

তখন বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; জানিলেন যে, তিনি সম্রাটের নিকট স্বদেশ যাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, সেই সন্দেহ প্রযুক্তই সম্রাট্ নগরের কোতওয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে শিবজীর বাটীর চতুর্দ্দিকে দিবারাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, হিতৈষী সীতাপতি গোস্বামী গণনা দ্বারা বা কোনও অনুসন্ধানে আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়া রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। মনে মনে সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটাচারিতা এতদিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদরপূর্ব্বক পত্র লিখিয়া দিল্লীতে আহ্বান করিলেন,—শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজসভায় অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভায় যাইতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে প্রকৃত বন্দী করিলেন। কোন কোন অজগর সর্প গো-মহিষাদি ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ইচ্ছানুসারে দংশন করে, ক্রূর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানস-চক্ষে অতীত ও বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দ্রুত পদবিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—

“আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না; চতুরতায় আপনাকে অদ্বিতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিদ্যায় বালক নহে। * * এই ঋণ একদিন পরিশোধ করিব,—দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে!”

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্তকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, শিবজীর আজ্ঞায় সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

শিবজী বলিলেন—"পণ্ডিতপ্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন;—এই খেলা আমাদেরও খেলিতে হইবে; আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলায় অপরিপক্ক নহে,—খেলিবে।

"অদ্য আমরা বন্দী হইয়াছি, আমি কল্য রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম; কিন্তু অনুচরবর্গকে পূর্ব্বে পরিত্রাণ না করিয়া আমার আত্মপরিত্রাণের ইচ্ছা নাই, সে বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?"

ন্যায়শাস্ত্রী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আপনার অনুচরদিগের স্বদেশগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করুন, এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, আপনার অনুচরসংখ্যা যত হ্রাস হয় তাহাতে সম্রাট্ আহ্লাদিত ভিন্ন দুঃখিত হইবেন না। আমি বিবেচনা করি, অনুমতি চাহিলেই পাইবেন।"

শিবজী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—"মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয় ধূর্ত্ত আরংজীব এবিষয়ে আপত্তি করিবেন না।"

সেই মর্ম্মে একখানি আবেদনপত্র প্রস্তুত হইল; শিবজী যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল; শিবজীর অনুচরেরা সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সম্রাট্ আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগের সকলকে এক একখানি অনুমতিপত্র দান করিলেন। শিবজী কয়েক দিন মধ্যে সেই সমস্ত অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন, মনে মনে বলিলেন,—

"মূর্খ! শিবজীকে বন্দী রাখিবেন? এখন একজন অনুচরের বেশ ধরিয়া ইহার মধ্যে একখানি অনুমতি পত্র লইয়া দিল্লীত্যাগ করিলে কি করিতে পার? যাহা হউক অনুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাইবে, শিবজী আপনার জন্য উপায় উদ্ভাবনা করিতে সক্ষম।"

* * * *

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধিকৌশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লীর ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয় করিয়া সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎসঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অদ্য চতুরতা দ্বারা মহাবীর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল একবার সেই ক্রুর, কপটাচারী, অথচ সাহসী, দূরদর্শী, আরংজীবের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি।

রাজকার্য্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব "গোসলখানা" নামক সভাগৃহের পার্শ্বস্থ একটী ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটী মন্ত্রীদিগের সহিত গুপ্ত পরামর্শের স্থল, কিন্তু অদ্য আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, কখন কখন ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নয়নে ও কম্পিত অধরে রোষ বা অভিমান বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণা-সফলতাজনিত সন্তোষে সেই ওষ্ঠপ্রান্ত হাস্যরেখায় অঙ্কিত হইতেছে। সম্রাট্ কি করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন সেই কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দুধর্ম্মের আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আরও পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী করিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইতেছেন? জানি না সম্রাটের কি চিন্তা, তাঁহার সভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও লোক, কোনও সেনাপতি, কোনও মন্ত্রীকে সন্দিগ্ধমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না,—মনের ভাব বলিতেন না। নিজের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে সকলকে পুত্তলিকার ন্যায় চালাইবেন, সমগ্রদেশ সুন্দর শাসন করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বাসুকী যেরূপ নিজ মস্তকে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, বিশ্রাম চাহেন না, কাহারও সহায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসাধারণ মানসিক বলে ভারতে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য একাকী বহন করিবার মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহিতেন না।

অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন, এরূপ সময় একজন সৈনিক তস্‌লীম করিয়া বলিল—

"সম্রাটের জয় হউক! জহাঁপানা! দানেশমন্দ্ নামক আপনার সভাসদ্ আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।"

সম্রাট্ দানেশমন্দ্‌কে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, চিন্তারেখাগুলি ললাট হইতে অপসৃত করিলেন, সুন্দর হাস্য মুখে ধারণ করিলেন।

দানেশমন্দ্ আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন না, রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস করিতেন না। তবে তিনি পারস্য ও আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং সম্রাট্ তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন, কখন কখন কোন কোন কথায় বাক্যচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা দানেশমন্দ্ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন; আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারা যখন বন্দী হয়েন, দানেশমন্দ্ তাঁহার প্রাণরক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবম্বিধ পরামর্শ কুটীল আরংজীবের মনোগত হইত না,—আরংজীব

তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শী বলিয়া মনে করিতেন,—তথাপি তাঁহার বিদ্যা ও ধন ও পদ-মর্য্যাদার জন্য সম্যক্ আদর করিতেন। সরলস্বভাব বৃদ্ধ দানেশমন্দ্ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

বলিলেন—

"এ সময়ে জহাঁপানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা দাসের ধৃষ্টতা,—কেননা এ সময় সম্রাট্ রাজকার্য্যের পর বিশ্রাম করেন। তবে যে আসিয়াছি, কেবল আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত; পারস্য কবি সুন্দর লিখিয়াছে, 'সূর্য্যের দিকে জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া দেখে, সূর্য্য কি তাহাতে বিরক্ত বা কিরণদানে বিরত হন'?"

সম্রাট্ সহাস্যবদনে বলিলেন, "দানেশমন্দ্! অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক, আপনি সর্ব্বসময়েই সমাদরের পাত্র।"

এইরূপ মিষ্টালাপ ক্ষণেক হইলে পর দানেশমন্দ্ অন্য কথা আনিলেন; বলিলেন—

"জহাঁপানা! "আলমগীর" নাম সার্থক করিবেন! সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন—

"কেন, সে বিষয়ে আমার কি উদ্যোগ দেখিলেন?"

দানে। "দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু আপনার পদতলে।"

আরং। "শিবজীর কথা বলিতেছেন? হাঁ ইন্দুর কলে পড়িয়াছে!" তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রণা গোপনার্থে বলিলেন, "দানেশমন্দ্! আপনি আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই সম্মান করা আমার উদ্দেশ্য। শিবজী ধূর্ত্ত বিদ্রোহী হউক, যোদ্ধা বটে, তাহাকে সম্মানার্থই দিল্লীতে আনিয়াছিলাম। রাজসভায় সমুচিত সম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ মূর্খ যে, রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং অন্য শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায় আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি, যে দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক সন্ন্যাসী ও বিদ্রোহীর সহিত পরামর্শ করে, সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট না করিতে পারে এইজন্যই কোতওয়ালকে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছি। কয়েকদিন পর সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিব।"

দানে। "সম্রাটের এ আদেশ শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।"

আরং। "কেন?" আরংজীবের মুখে সেইরূপ হাস্য,—কিন্তু তীক্ষ্ণনয়নে দানেশমন্দের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন, তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

উদারচেতা দানেশমন্দ্ বলিলেন, "সম্রাট্‌কে পরামর্শ দি আমার কি সাধ্য, কিন্তু জহাঁপানা! যদি শিবজীর প্রতি দয়ালু আচরণ না করিতেন, যদি তাহাকে চিরকালের জন্য বন্দী করিতেন, তাহা হইলে মন্দ লোকে নানারূপ অখ্যাতি করিত, বলিত, যে শিবজীকে আহ্বান করিয়া রুদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত নহে।"

আরংজীব ঈষৎ কোপ সঙ্গোপন করিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন—

"দানেশমন্দ্! মন্দ লোকের কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে সুবিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়া শিবজীর দোষের জন্য তাহাকে সতর্ক করিয়া দিব, পরে দয়াপ্রকাশে তাহাকে সসম্মানে বিদায় দিব।"

দানে। "এরূপ সদাচরণেই জহাঁপানার প্রপিতামহ আকবর দেশশাসন করিয়াছিলেন, এরূপ সদাচরণে আপনারও খ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।"

আরং। "সে কিরূপ?"

দানে। "সম্রাটের অগোচর কিছুই নাই। দেখুন, আকবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রুসঙ্কুল ছিল; রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে, সর্ব্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশূন্য ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে সমস্ত সাম্রাজ্য নিঃশত্রু ও নির্ব্বিরোধ হইয়াছিল,—যাহারা পূর্ব্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুতেরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে! এ জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল? কেবল বাহুবলে? কেবল সাহসে? তৈমুরের বংশে কাহারও সাহস বা বাহুবলের অভাব নাই,—তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন করিতে পারেন নাই কি জন্য? না জহাঁপানা! কেবল সদাচরণেই এরূপ জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি শত্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবম্বিধ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত, মানসিংহ, টোডরমল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগণই মুসলমান সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছিলেন। উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়, অধম কাফেরের প্রতিও সদাচরণ ও

বিশ্বাস করিলে তাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়; মানবের এই প্রকৃতি,—শাস্ত্রের এই লিখন। আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শিবজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন; জহাঁপানা! তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ থাকিবেন!"

দানেশমন্দ্‌ কিজন্য সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীশ্বর শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্দী করায় জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ্‌ মাত্রেই লজ্জিত হইয়াছিলেন; দানেশমন্দ্‌কে সম্রাট্‌ সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে কথাচ্ছলে সম্রাটের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শিবজীর প্রতি ভদ্রাচরণ করিয়া সম্রাট্‌ তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে দেন, দানেশমন্দ্‌ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। দানেশমন্দ্‌ জানিতেন না যে হস্তদ্বারা প্রকাণ্ড ভূধরকে বিচলিত করা যায়, কিন্তু পরামর্শদ্বারা আরংজীবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বিচলিত করা যায় না।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথাগুলি কুটিল আরংজীবের নিকট অতিশয় নির্ব্বোধের কথার ন্যায় বোধ হইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"হাঁ, দানেশমন্দ্‌ যেরূপ শাস্ত্রবিশারদ, মানব-হৃদয়ও সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন, দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শিবজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবেন, রাজস্থানে ত বিদ্রোহীগণ স্তম্ভস্থাপন পূর্ব্বেই করিয়াছে; কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব ও বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিব,—এই চতুঃস্তম্ভের উপর মোগল সাম্রাজ্য সুন্দর ও সুদৃঢ় স্থাপিত হইবে!"

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "সম্রাটের পিতা দাসকে অনুগ্রহ করিতেন, সম্রাট্‌ও যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, সেইজন্য কখন কখন মনের কথা বলি,—নচেৎ জহাঁপানাকে পরামর্শ দি, এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই।"

আরংজীব দানেশমন্দ্‌কে নির্ব্বোধ সরল জানিয়াও তাঁহার সেই সরলতার জন্য তাঁহাকে ভাল বাসিতেন,— তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন—

"দানেশমন্দ্‌! আমার কথার দোষ গ্রহণ করিও না। আকবরশাহ বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুসলমানকে সমানচক্ষে

দেখিয়া তিনি কি ধর্ম্ম-সঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন? আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের সামান্য দৈনিক কার্য্য সম্পাদনকালেও দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ কার্য্য হয়, পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসনকার্য্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না? নিজ বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ হই, কিজন্য ঘৃণিত কাফেরদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব? আরংজীব বাল্যাবস্থা অবধি নিজ অসির উপর নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসিদ্বারা সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, নিজ অসিদ্বারা দেশশাসন করিবে, কাহারও সহায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।”

দানে। “জহাঁপানা! স্বহস্তে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ সাম্রাজ্য শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয়? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে কি সর্ব্বসময়ে আপনি বর্ত্তমান থাকিতে পারেন? অন্য কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে?”

আরং। “অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভৃত্যের ন্যায় থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে! অদ্য আমি যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব, কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে; অদ্য যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে। এ অবস্থায় ক্ষমতা ও বিশ্বাস অন্যে ন্যস্ত না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্দ্! তুমি যখন অশ্বে আরোহণ কর, অশ্বকে বল্গা ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যেদিকে ফিরাও সেইদিকে যাইতে বাধ্য হয়। সম্রাটেরও সেইরূপে শাসন করা উচিত, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না, সমস্ত ক্ষমতা নিজহস্তে রাখিবে, কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীকরণপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট কার্য্যগ্রহণ করিবে।”

দানে। “প্রভু! মনুষ্য ত অশ্ব নহে, তাহাদিগের মহত্ত্ব আছে, নিজ নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে।”

আরং। “মনুষ্য অশ্ব নহে তাহা জানি; সেইজন্যই অশ্বকে বল্গাদ্বারা চালাই, মনুষ্যকে উন্নতির আশা ও শাস্তির ভয়ের দ্বারা চালাই। যে উত্তম কার্য্য করিবে তাহাকে পুরস্কার দিব, যে অধম কার্য্য করিবে তাহাকে শাস্তি দিব। পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয়ে সকলে কার্য্য করিবে; ক্ষমতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা আরংজীব নিজহৃদয়ে ও নিজ বাহুবলে ন্যস্ত রাখিবে।”

দানে। "প্রভু! পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয় ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ত অন্য ভাবও আছে। মনুষ্যের মহত্ত্ব আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে! যে শাস্তিভয়ে কার্য্য করে, সে কোনরূপে কেবল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিরস্ত থাকে; কিন্তু যাহাকে আপনি সম্মান করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার জন্য প্রভুকার্য্যে নিজের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণও শাস্ত্রে দেখা যায়।"

আরংজীব সহাস্যে বলিলেন—

"দানেশমন্দ! আমি তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ নহি; কবিতায় যাহা লিখে তাহা বিশ্বাস করি না। মানবপ্রকৃতি আমার শাস্ত্র; মানবের মহত্ত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি। শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক দেখিয়াছি। সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজহস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি, সেইজন্য কাফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছি, বিদ্রোহোন্মুখ রাজপুতদিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিঃশত্রু করিব, বিজয়পুর ও গলখন্দ জয় করিব, হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত আরংজীব একাকী শাসন করিবে, কাহারও সহায়তা লইবে না, আলমগীর নিজের নাম সার্থক করিবে।"

উৎসাহে সম্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল, তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অদ্য কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দানেশমন্দের উদার চরিত্র জানিতেন, তাঁহার নিকট দুই একটী কথা কহিলে কোনও হানি নাই, জানিতেন।

ক্ষণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন, "সরলস্বভাব বন্ধু! অদ্য আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে?"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সেইদিন সরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না!

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন এরূপ সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল—

"রামসিংহ জহাঁপানার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।"

সম্রাট্ আদেশ করিলেন,—"আসিতে দাও।"

ক্ষণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহের সহিত পাঠকের পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছে। আকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, ললাট প্রশস্ত, নয়নযুগল উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, সমস্ত অবয়ব যৌবন-কান্তিতে শোভিত, যৌবনবলে বলিষ্ঠ। যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—

"সম্রাট্‌কে এরূপ সময়ে সাক্ষাৎ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়, কিন্তু পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।"

আরং। "আপনার পিতার নিকট আমরাও অদ্য পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত সংবাদ অবগত আছি।"

রাম। "তবে সম্রাট্‌ অবগত আছেন যে পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া, শত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যের অল্পতাবশতঃ সে নগর এপর্য্যন্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষ গলখন্দের সুলতান বিজয়পুরের সহায়ার্থ নেকনাম খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক্‌ সৈন্যসমেত প্রেরণ করিয়াছেন।"

আরং। "সমস্ত অবগত হইয়াছি।"

রাম। "চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অল্পসংখ্যক্‌ সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।"

আরং। "আপনার পিতা বীরাগ্রগণ্য! তিনি নিজের সৈন্যে বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না?"

রাম। "মনুষ্যের যাহা সাধ্য, পিতা তাহা করিবেন; শিবজী পূর্ব্বে পরাস্ত হয়েন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন; বিজয়পুর পূর্ব্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা ততদূর যাইয়া সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন, এখন আপনার নিকট অল্পমাত্র সৈন্য-সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য শেষ হয়, দক্ষিণদেশে মোগলসাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।"

এরূপ অবস্থায় অন্য কোন সম্রাট্‌ সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশবিজয়কার্য্য সমাধা করিতেন। আরংজীব আপনাকে বহু-দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ করিলেন না। বলিলেন—

"রামসিংহ! আপনার পিতা আমাদের সুহৃদ্‌প্রবর, তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম, তাঁহাকে পত্র লিখিবেন যে,

তিনি নিজের অসাধারণ বাহুবলে জয়সাধন করিবেন, সম্রাট্ দিবানিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন; কিন্তু এখন দিল্লীতে সেনাসংখ্যা অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে অক্ষম।"

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন, "জহাঁপানা! পিতা দিল্লীশ্বরের পুরাতন দাস, আপনার কালে, আপনার পিতার কালে অসংখ্য যুদ্ধে যুঝিয়াছেন, অনেক কার্য্যসাধন করিয়াছেন; দিল্লীশ্বরের কার্য্যসাধন ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সাহায্য দান না করিলে তিনি বোধ হয় সসৈন্যে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।" রামসিংহের কণ্ঠরুদ্ধ হইল, তাঁহার নয়নে জলবিন্দু।

বালক! জলবিন্দুতে আরংজীবের গভীর উদ্দেশ্য, দৃঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না!

সে উদ্দেশ্য—সে মন্ত্রণা কি? রাজা জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতাপান্বিত সেনাপতি, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বিস্তীর্ণ যশঃ, অনন্ত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ! আজীবন তিনি নিষ্কলঙ্কে দিল্লীশ্বরের কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোন সেনাপতির থাকা বিধেয় নহে; সম্রাট্ এতদূর জয়সিংহকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ যুদ্ধে যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ করিতে না পারিয়া অবমানিত হয়েন, তবে সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। যদি সসৈন্যে বিজয়পুরসম্মুখে নষ্ট হয়েন, দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের একটী কণ্টকোদ্ধার হইবে! ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় আরংজীবের উদ্দেশ্যগুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অদ্য জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উদ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সেজন্য কি সূক্ষ্ম মন্ত্রণাজাল অদ্য ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচরিত্র যুবকপুত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছেন বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী সম্রাট্ উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন?

দয়া মায়া প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তিসমূহ আরংজীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজহৃদয়েও স্থান দিতেন না; আত্মপথ পরিষ্কারার্থ অদ্য একটী পতঙ্গ সরাইয়া ফেলিলেন, কল্য একজন সহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উভয় কার্য্যই একই প্রকার ধীর নিরুদ্বেগ হৃদয়ে করিতেন! একদিন পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র আত্মীয়বর্গ সেই উন্নতিপথে পড়িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে মায়াবশতঃ জীবিত রাখেন

নাই, জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই, আপন উদ্দেশ্যসাধনে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জীবিত থাকিলে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে; জল্লাদ! তাহাকে সরাইয়া সম্রাট্ আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও!

মন্ত্রণাসাধনের জন্য অদ্য আবশ্যক যে জয়সিংহ সসৈন্যে হত হইবেন; তিনি ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী, অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, তিনি সসৈন্যে মরিবেন! এই পরিচ্ছেদ-বিবৃতি সময়ের পর কয়েক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ আসিল, অবমানিত, অকৃতার্থ জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন—

“প্রভু! আমার একটী যাচ্ঞা আছে।”

আরং। “নিবেদন করুন।”

রাম। “শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্যদান করিয়াছিলেন যে দিল্লীতে শিবজীর কোন আপদ ঘটিবে না।”

আরং। “আপনার পিতা সে কথা আমাদের অবগত করাইয়াছেন।”

রাম। “রাজপুতদিগের মধ্যে বাক্যদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে অতিশয় নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা যে প্রভু শিবজীর যে কোনও দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিন্।”

আরংজীব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “সম্রাটের যাহা উচিতকার্য্য সম্রাট্ তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না।”

আরও ক্ষণেক দানেশমন্দের সহিত কথোপকথনের পর সম্রাট্ বেগম-মহলে যাইলেন, দানেশমন্দ ও রামসিংহ ক্ষুণ্ণমনে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটী কীট সম্রাটের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়াছেন; দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না!

জয়সিংহের যে দোষ, শিবজীরও সেই দোষ; শিবজীও সন্ধিস্থাপনাবধি প্রাণপণে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছেন, নিজ সৈন্যদ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা; আরংজীব কোনও

ভৃত্যের উপর বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারেন না, কাহাকে [illegible]তিলেন করেন না।

যাহাকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহারা ক্রমে অবিশ্বাসের যোগ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা ও দিল্লীর চিরবিশ্বস্ত রাজপুতেরা দিল্লীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্জলিত করিল, মোগল-সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া।

"দূরে গেল জটাজুট।"

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লীনগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবানিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ, দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহস্থল, অদ্য যেরূপ রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে শিবজী আর নাই! রাজপথ দিয়া বহুসংখ্যক্ লোক গমনাগমন করিত ও সেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত, আশ্বারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ ক্ষণেক অশ্ব থামাইয়া প্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন; শিবিকারোহী রাজা বা মনসব্দার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেই-দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন; শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এইরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে সর্ব্বসময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্ব্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল তাহা পূর্ব্বমত রাখিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে সর্ব্বদাই ভাবিতেন, "যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিন্দা না হইয়াই অনায়াসে কণ্টকোদ্ধার হইবে!"

নাই, সন্ধ্যাকাল সমাগত. এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান হাকিম শিবির হইতে শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন?" হাকিম উত্তর করিলেন, "সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি।" সসম্মানে প্রহরীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার ভৃত্য সম্বাদ দিল, যে সম্রাট্ একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিষপ্রয়োগের জন্য সম্রাট্ একাণ্ড করিতেছেন; ভৃত্যকে আদেশ করিলেন—

"হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে, আমি হিন্দু, অন্যরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সম্রাটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটী কোটী ধন্যবাদ জানাইবেন।" কিন্তু ভৃত্য এই আদেশ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই হাকিম অনাহূত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শিবজীর হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সঙ্গোপন করিয়া অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন, ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে এরূপ লোকের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে, অতি শুক্ল শ্মশ্রু লম্বিত হইয়া উরঃস্থল আবৃত করিয়াছে; মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, হাকিমের স্বর ধীর ও গম্ভীর। বলিলেন—

"মহাশয়! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুত হইয়াছি, আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না; তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্মসাধন করিব।"

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন এ বিপদ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হাকিম। "আপনার পীড়া কি?"

কাতরস্বরে শিবজী বলিলেন, "জানি না এ কি ভীষণ পীড়া; শরীর সর্ব্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বস্থানে বেদনা।"

হাকিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসায় শরীর অধিক জ্বলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্লেশসঞ্জাত; আপনার কি সেই পীড়া?"

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপরূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন; মুখ সেইরূপ গম্ভীর, কোনও ভাবই লক্ষিত হইল না। শিবজী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন।

শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন—

“আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ি ত সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সজোরে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এসমস্ত কি প্রবঞ্চনামাত্র?”

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূর্ব্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখমণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোনও ভাব লক্ষিত হইল না। শিবজীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধসম্বরণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিলেন—

“আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যান্য চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন; এ মহৎ পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবননাশ করিতেছে।”

হাকিম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—

“‘আলফলায়লা ও লায়লুন’ নামক আমাদের যে প্রকাণ্ড চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দ্দেশ আছে; তাহার মধ্যে কয়েকটী বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়ার কথা লিখিত আছে। এক —
‘আকল্‌তু সামাকাতা হত্তা রাশি হা’। বালকেরা এই পী
চুরি করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করে, ইহার চিকিৎসা প্র
‘বকুস্‌তনে আসিরী ইশারৎ কর্দ্দ।’ কয়েদীগ
পীড়া ভাণ করে, ইহার চিকিৎসা শির
শূন্য পীড়া আছে, শত্রুহস্ত হই
তাহারও ঔষধি নির্দ্দেশ আছে

শিবজী ঐ সমস্ত শাস্ত্র
তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর,
পারিলেন। ই

হয়, অব্যর্থ বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে।” এই বলিয়া হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

শিবজীর হৃৎকম্প হইল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল! ঔষধিসেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু!

হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিয়া আনিল, শিবজী বলিলেন, “মুসলমানের স্পৃষ্ট পানীয় আমি পান করিব না।” সজোর হস্তসঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

হাকিম কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন, “এরূপ সজোর হস্তসঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে।”

শিবজী অনেকক্ষণ অতি কষ্টে ক্রোধসম্বরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। সহসা উঠিয়া বসিলেন, “রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি,” বলিয়া মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের শুক্ল শ্মশ্রু সজোরে আকর্ষণ করিলেন।

বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই মিথ্যা শ্মশ্রু সমস্ত খসিয়া আসিল, চপেটাঘাতে উষ্ণীষ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহার বাল্যসুহৃদ্ তন্নজী মালশ্রী খিল্‌খিল্ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল!

কষ্টে অনেকক্ষণ পর হাস্য সম্বরণ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন—

“প্রভু কি সর্ব্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন? তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে! াতে এখনও মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে!”

লিলেন, “বন্ধু, সিংহের সহিত খেলা করিলে কখন

হউক, তোমাকে দেখিয়া কতদূর আহ্লাদিত

ই তোমাকে প্রত্যাশা করিতেছিলাম,

আছি, একে একে নিবেদন

বর্গ সমস্তই

তন্ন। "সেই সমস্ত অনুচর দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোস্বামীর বেশ ধরিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছে; মথুরায় অনেক দেবালয়ের পুরোহিতগণও প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে যেরূপ লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও করিয়াছি।"

শিব। "চিরবন্ধু! তুমি যেরূপ কার্য্যদক্ষ, অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশ যাইতে পারিব।"

তন্ন। "দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেরূপ একটী তীব্রগতি অশ্ব রাখিতে বলিয়াছিলেন তাহাও রাখিয়াছি; যেদিন স্থির করিবেন, সেইদিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে।"

শিব। "ভাল।"

তন্ন। "রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। রামসিংহ পিতার ন্যায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা, শুনিয়াছি স্বয়ং সম্রাটের নিকট যাইয়া আপনার জন্য সাশ্রুনয়নে আবেদন করিয়াছিলেন।"

শিব। "সম্রাট্ কি বলিলেন?"

তন্ন। "বলিলেন, সম্রাটের যাহা কর্তব্য তাহা ক

শিব। "বিশ্বাসঘাতক! কপটাচারী! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে।"

তন্ন। "রামসিংহ সে বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু যুবক সরোষে আমার নিকট বলিলেন, যে রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না, অর্থদ্বারা, সৈন্যদ্বারা, যেরূপে পারেন, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায় তাহাতেও স্বীকার আছেন।"

শিব। "পিতার উপযুক্ত পুত্র! কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদগ্রস্থ করিতে চাহি না, আমি পলায়নের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি তাহা তুমি তাঁহাকে জানাইয়াছ?"

তন্ন। "জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

শিব। "ভাল।"

তন্ন। "তদ্ভিন্ন দানেশমন্দ্ প্রভৃতি যাবতীয় আরঙ্গজীবের সভাসদকে মিষ্ট কথায়, বা অর্থদ্বারা, বা নজর দিয়া আপনার পক্ষবর্ত্তী করিয়াছি।

দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান এরূপ বড়লোক কেহ নাই যিনি আপনার পক্ষবর্ত্তী নহেন; কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন না।”

শিব। “তবে সমস্ত প্রস্তুত! আমি আরোগ্যলাভ করিতে পারি?”

সহাস্যে তন্নজী বলিলেন, “আমার ন্যায় বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি থাকিতে পারে? কিন্তু আপনার পানের জন্য সুন্দর মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন?”

শিবজী বলিলেন, “বন্ধু, আর এক পাত্র প্রস্তুত কর।” তন্নজী সেই পাত্র লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন; শিবজী পান করিলেন,—সহাস্যে বলিলেন, “চিকিৎসক! আপনার ঔষধি যেরূপ মিষ্ট সেইরূপ ফলদায়ী, আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে।”

তন্ন। “তবে এখন প্রস্থান করি।” শিবজীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় উষ্ণীষ ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া তন্নজী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, “পীড়া কিরূপ দেখিলেন?”

হাকিম উত্তর করিলেন, “পীড়া অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে অনেক উপশম হইয়াছে; বোধ করি অল্পদিনের মধ্যেই শিবজী এ রোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন।”

হাকিম শিবিকারোহণে চলিয়া গেলেন; এক প্রহরী অন্যকে বলিল—“এ হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্যে যে পীড়া আরাম করিতে পারিল না, হাকিম একদিনে তাহা আরাম করিল কিরূপ?”

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল, “হবে না কেন, এ যে রাজবাটীর হাকিম!”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য।

" এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হ'য়ে ।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ॥
হে বীর, কমলচক্ষে কর পরিহার ।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার ॥"
কাশীরাম দাস।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পর নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে। নগরে পুনরায় ধূমধাম পড়িয়া গেল; সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ শিবজীর আরোগ্যে দুঃখিত হইলেন; কোন কোন মহদাশয় মুসলমান এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে, দোকানে, মস্জীদে সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল; আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

নগরে ধূমধাম পড়িয়া গেল! শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড়লোকের বাটীতে পাঠাইতে লাগিলেন। পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি, প্রতি মস্জীদে ফকীরগণের সেবনার্থে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন! সম্রাটের মনে যাহাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই বদান্যতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।—"দিল্লীকালাড্ডুর" ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তাহাতে আর কেহ "পস্তাইয়া" ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি শীঘ্রই পস্তাইয়াছিলেন!

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া নিজে গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আধার কখন কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ হইত, ৮ কি ১০ জন লোকে বহিয়া লইয়া যাইত। কয়েকদিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটী প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল—

"এ কাহার বাটীতে যাইবে?" বাহকেরা উত্তর করিল, "রাজা জয়সিংহ-সদনে।"

প্রহ। "তোমাদের প্রভু আর কতদিন এরূপ মিষ্টান্ন পাঠাইবেন?"

বাহ। "এই অদ্যই শেষ।"

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।

কতক পথ যাইয়া একটী অতি সঙ্গুপ্ত স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুইটী আধার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে! বাহকেরা একটী ইঙ্গিত করিল, একটী আধার হইতে শিবজী, অপরটী হইতে শম্ভুজী বাহির হইলেন; উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরাভিমুখে যাইলেন। সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি রাজপথে এক একজন লোক যখন নিকট দিয়া যায়, শম্ভুজীর হৃদয় ভয়ে, উদ্বেগে নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজীর চিরজীবন এইরূপ বিপদ্পূর্ণ, তাঁহার পক্ষে কিছুই নূতন নহে; তথাপি তাঁহারও হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

কম্পিতহৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন, একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কে যায়?"

শিবজী উত্তর করিলেন, "গোস্বামী। হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণাম কেবলং।"

"কোথা যাইতেছ?"

"মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক হর্ম্ম্যাদি ছিল, অনেক ধনাঢ্য ও উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন। সে সকল দুইপার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও শম্ভুজী ত্বরিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। "হরের্ণাম হরের্ণাম—" ইত্যাদি।

দূরে একটী বৃক্ষতলে একটী অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেইদিকে যাইলেন, দেখিলেন, তন্নজী-বর্ণিত অশ্বই বটে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, অশ্বরক্ষক! তোমার নাম কি?"

"জানকীনাথ।"

"কোথায় যাইবে ?"

"মথুরা।"

শিবজী বলিলেন, "হাঁ, এই অশ্ব বটে।" শিবজী অশ্বে আরোহণ করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দ পল্লী বা প্রান্তর দিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন। আকাশে নক্ষত্রগুলি মিট্ মিট্ করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণকলেবরা যমুনা নদী প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথ, ঘাট কর্দ্দম বা জলপূর্ণ। শিবজী উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল; শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেস্থানে বৃক্ষ বা কুটীর নাই, অগত্যা পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তিনজন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী অভিমুখে আসিতেছেন; তাহাদিগের কোষে অসি, হস্তে বর্শা। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া সেইদিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। শিবজীর হৃদয় উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে যায় ?"

শিব। "গোস্বামী।"

অশ্বারোহী। "কোথা হইতে আসিতেছ ?"

শিব। "দিল্লীনগর হইতে।"

অশ্বারোহী। "আমরা দিল্লীনগর যাইব, কিন্তু পথ হারাইয়াছি, আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দাও, পরে মথুরায় যাইও।"

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা বলপ্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে; কেননা দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ্! ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল, অপর দুইজন অস্পষ্টস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ ?

একজন বলিল, "এ স্বর আমি জানি,—আমি দক্ষিণদেশে শায়েস্তাখাঁর অধীনে অনেকদিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি পথিক গোস্বামী নহে।"

অপরজন বলিল, “ তবে কে ?”

“আমি সন্দেহ করি এ স্বয়ং শিবজী, দুইজন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ঠিক একরূপ হয় না।”

“ দূর মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।”

“ সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে পুনা ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল।”

“ ভাল, মস্তকের বস্ত্র তুলিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে।”

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিল, শিবজী চিনিলেন, শায়েস্তাখাঁর অধীনস্থ একজন প্রধান সেনানী!

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত, শিবজী একাকী তিনজনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মুষ্টি-আঘাতে অচেতন করিলেন, এমন সময় আর দুইজন অসিহস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী নির্ব্বাক্! ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। আবার বন্দী হইবেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরংজীব কর্ত্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শম্ভুজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু জলে আপ্লুত হইল। বলিলেন, “দেবদেব মহাদেব, জীবনে একমনে আপনার পূজা করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার যাহা উদ্দেশ্য থাকে তাহাই করুন।” আশা, ভরসা, উদ্যম এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইল।

সহসা একটী শব্দ হইল, শিবজী দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটী তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিনজন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিনজনই গতজীবন!

শিবজী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে সেই অশ্বরক্ষক জানকী এই তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। বিস্মিত হইয়া জানকীকে নিকটে ডাকিয়া জীবনরক্ষার জন্য শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে শিবজী আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সে অশ্বরক্ষক নহে, সীতাপতি গোস্বামী অশ্বরক্ষকবেশে!

তখন সহস্রবার ব্রাহ্মণের ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিলেন, “ সীতাপতি! আপনি ভিন্ন শিবজীর বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে? আপনাকে অশ্বরক্ষক মনে করিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন। আপনার এ কার্য্যের জন্য আমি কি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি?”

সীতাপতি শিবজীর সম্মুখে জানু গাড়িয়া করযোড়ে বলিলেন—

"রাজন্! ছদ্মবেশ ক্ষমা করিয়া দিবেন? পুনরায় কি সরযু সেই হৃদয়-
নহি, আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য স. সরযু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,
অবধি আপনার সেবা করিয়াছি, আজীবন
ইহা ভিন্ন কামনা নাই; অন্য পুরস্কার চাহি না। ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ
জানিয়া কখন কোন দোষ করিয়া থাকি, প্রভু নি। বৃক্ষের উপর হইতে
ক্ষমা করুন।"
নিয়া একদিন রঘু-

শিবজী চকিত ও বাক্‌শূন্য! কিন্তু হৃদয়ের উদ্বেগ ন; সরযুর মুখে
পারিলেন না। বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া রঘুনাথকে বসিয়া
ধারণ করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট শিবজী শত অপরাধে অপরাধী, কিন্তু এই মহৎ আচরণে আমাকে যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছ, তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম,—তোমার অবমাননা করিয়াছিলাম, স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শিবজী যতদিন জীবিত থাকিবে তোমার গুণ বিস্মৃত হইবে না, প্রণয় ও যত্নে যদি এ মহৎ ঋণ পরিশোধ করা যায়, তবে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিবে।"

শান্ত নিস্তব্ধ রজনীতে উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনসুখে বিমুগ্ধ হইলেন। রঘুনাথের ব্রত অদ্য শেষ হইল, শিবজীর হৃদয়বেদনা অদ্য দূর হইল; বালকের ন্যায় উভয়ে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

"কি দারুণ বুকের ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পিরিতের কথা॥
সই! কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া কাঁদিয়া জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে ধনী পিরতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী, প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, সে গতি হইয়া, পরাণ সংশয় দেখি॥"
চণ্ডীদাস।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরযু দেখিলেন হৃদয় শূন্য! কে না জানে

র্ব্বহনীয়, কিন্তু তাহার পর
যে দুঃখ উছলিতে থাকে, নীরবে
তে থাকে, সেই শোক অধিক মর্ম্মভেদী।
প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিলে আমরা বালকের না
া উঠি, জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ভূমিতে গড়াগড়ি ,—সে
র্ত্তনাদেই নিবারিত হয়। কিন্তু দিবস যাইলে,
র তিবাহিত হইলে, সেই প্রিয়জনের কথা যখন
, রবে রজনী অন্ধকারে যখন হৃদয় আপন শোকপারাবারে
তে থাকে,—নয়নের ার যখন উদ্ঘাটিত হয়, নীরবে অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে,—উঃ মনুষ্যজীবনে সেই যাতনাই অসহ্য! প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে, তাহার বাক্যগুলি, কার্য্যপরম্পরা, স্নেহ, ভালবাসা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে থাকে, নিস্তব্ধ রজনীতে সেই পূর্ব্বকথা একে একে উদয় হইতে থাকে, তখনই হৃদয় শূন্য হয়, আমারা বালিকার ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া নীরবে রোদন করিতে থাকি!

দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, সরযুর চিন্তা দিনে দিনে মর্ম্মভেদী হইতে লাগিল। অন্ধকার নিশীথে কখন কখন বালিকা একাকী গবাক্ষপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কত চিন্তা করিত কে বলিবে? কত কথা একে একে স্মরণ হইত, কতবার নীরবে নয়ন হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু প্রবাহিত হইত। নীরবে সেই গবাক্ষ দিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়বল্লভ আর আসিলেন না!

কখন বা সেই পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণদেশ মনে জাগরিত হইত, সেই তোরণ-দুর্গ মনে উদয় হইত। সরযু একাকী ছাদে আসীন রহিয়াছেন, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গগন ও জগৎ আবৃত করিতেছে, সন্ধ্যার বায়ু বহিয়া বহিয়া সরযুর কেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে;—এমত সময় সেই দীর্ঘাকার উদার-মূর্ত্তি যুবক যেন আকাশপটে দেবচিত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল। সরযুর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, বালিকার হৃদয় নব নব ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অদ্য তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু সে মূর্ত্তি সরযুর হৃদয় হইতে অপনীত হয় নাই।

তাহার পরদিন সেই পুরুষসিংহ যে স্নেহগদ্‌গদ্‌স্বরে সরযুর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সভয়ে ধীরে ধীরে সরযুর কণ্ঠে যে কণ্ঠমালা দোলাইয়া দিয়াছিলেন, জীবন থাকিতে সরযু কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন? পুনরায় কি

সে বীর সরযূর কণ্ঠে কণ্ঠমালা পরাইয়া দিবেন? পুনরায় কি সরযূ সেই হৃদয়-বল্লভকে দেখিতে পাইবেন!—নীরবে সরযূ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, নীরবে গণ্ডস্থল দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল।

কখন বা অপরাহ্নে একাকী সরযূ আম্রকাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত! বৃক্ষের উপর হইতে কপোতকপোতী মৃদুস্বরে প্রেমগীত গাইতেছে, সেই গীত শুনিয়া একদিন রঘুনাথ কাণে কাণে সরযুকে কি কথা বলিয়াছিলেন স্মরণ হইল; সরযুর মুখে বিষাদের হাসি আসিল। আর একদিন ঐ বিশাল আম্রবৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ ও সরযূ একত্রে একটী সুমিষ্ট আম্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন, খাইতেছিলেন, আর পরস্পরে পরস্পরের দিকে সস্নেহে চাহিতেছিলেন, সে কথা হৃদয়ে জাগরিত হইল। ঐ কণ্টকবনের ভিতর দিয়া আর একদিন রঘুনাথ স্বয়ং ক্ষতবিক্ষত হইয়াও একটী সুন্দর বন্যপুষ্প চয়ন করিয়া সরযুর কেশে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, পরে কি মিষ্টস্বরে বলিয়াচিলেন, "সরযু! কি অপরূপ বনদেবীর রূপধারণ করিয়াছ।" আহা! সে সুমধুর স্বর, কি সরযু আর শুনিবেন, পুনরায় কি রঘুনাথ দুঃখিনীর জন্য পুষ্পচয়ন করিবেন, হতভাগিনীর ভাগ্যে কি এরূপ সুখ আছে? সরযু শোকে বিবশা হইলেন, নয়ন হইতে দুই চারি বিন্দু জল টস্ টস্ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল, নীরবে আপন অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিলেন। বৃথা চেষ্টা, আবার চিন্তা আসিল, আবার নয়ন পূর্ণ হইল।

কখন কখন রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সহসা হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত, ভাদ্রমাসের নদীর ন্যায় শোকপারাবার উথলিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযু প্রাণভরে কাঁদিতেন, শ্রাবণ মাসের ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিত। রঘুনাথের মধুময় মুখ, মধুময় কথা মনে পড়িত, একটী কথার পর অন্য কথা মনে উদয় হইত, শোকতরঙ্গের পর শোকতরঙ্গ হৃদয়ের উপর বহিয়া যাইত,—উপাধানে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বালিকা বিবশা ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া দরবিগলিত ধারায় উপাধান সিক্ত করিত। রজনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিত; বালিকা তখনও চিন্তাবিদগ্ধা, অথবা শোকে বিবশা হইয়া লুণ্ঠিত রহিয়াছে!

প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন করিতে উদ্যানে যাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি চিন্তা করিতেন কে বলিবে? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের দিকে চাহিতেন,

পুষ্পদলগত প্রাতঃশিশিরবিন্দুর সহিত দুই একটী পরিষ্কার স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু মিশাইয়া যাইত। সায়ংকালে বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন;—আহা! সে যে শোকের গীত, শ্রোতৃদিগের নয়নেও জল আসিত। বাল্যকালে রাজপুত চরণদিগের নিকট যত শোকের গীত শিখিয়াছিলেন তাহাই গাইতেন, ভিখারিণীর গীত গাইতেন, দুঃখিনীর গীত গাইতেন, অনাথিনীর গীত গাইতেন, সায়ংকালের নিস্তব্ধতায় সেই গীত ছাদ হইতে ধীরে ধীরে নৈশ আকাশে উত্থিত হইত, ধীরে ধীরে বায়ুমার্গে বিস্তৃত হইত, গীতের সহিত গায়কীর নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হইত, অথবা শোকপারাবার সহসা উথলিয়া উঠিত, গায়কীর কণ্ঠরুদ্ধ হইত, গীত সহসা লীন হইয়া যাইত।

দিবারাত্রি শোকচিন্তা শেষ হইত না, দিবারাত্রি সেই পথের দিকে সরযুবালা চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়বল্লভ আর আসিলেন না!

বসন্তকালে রঘুনাথ বিদায় হইয়াছেন, সে বসন্তকাল অতিবাহিত হইল, সুকণ্ঠ পক্ষীগুলি একে একে কুলায় হইতে উড়িয়া গেল। বৃক্ষসমূহে সুন্দর পুষ্পগুলি একে একে অদৃশ্য হইল, গ্রীষ্মকাল নানারূপ সুস্বাদু ফল আনিয়া মানবহৃদয় আনন্দিত করিল, জগৎকে সুশোভিত করিল! সরযুবালা সেই পথ চাহিয়া রহিয়াছেন,—সে পথে রঘুনাথ দর্শন দিলেন না!

আকাশে মেঘাড়ম্বর হইল, ক্রমে বর্ষার ধারা আরম্ভ হইল, নদনদী, জলাশয় পূর্ণকলেবর হইল, ক্ষেত্রে সুন্দর শস্য শোভা পাইতে লাগিল, জলে মাঠ, বিল, প্রান্তর প্লাবিত হইল। সেই প্রান্তরের উপর সরযু একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন, হৃদয়েশ কি এখনও কার্য্যসিদ্ধি লাভ করেন নাই? হৃদয়েশের কি এখনও সরযুকে মনে আছে? হৃদয়েশ কি কুশলে আছেন? জলে নয়ন প্লাবিত হইল,—আর দেখিতে পাইলেন না।

ক্রমে ক্রমে বর্ষার জল অপসৃত হইল, আকাশ পরিষ্কার হইল, নিশীথে শরচ্চন্দ্র উদয় হইয়া গগনে ও জগতে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে লাগিল। সরযুর হৃদয়াকাশ কবে পরিষ্কার হইবে, হৃদয়নাথ কবে নিশানাথের ন্যায় উদয় হইয়া সরযুর মনে আনন্দজ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন? সরযু পথ চাহিয়া রহিলেন, হৃদয়নাথ আসিলেন না!

এরূপ ভীষণ চিন্তায় ক্রমে সরযুর শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন কালিমাবেষ্টিত হইল! সরলস্বভাব জনার্দ্দন এখনও সরযুর হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সরযুর শরীরের

অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন, কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরযু অনেক যত্নে শোক সঙ্গোপন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু কিছু অনুমান করিয়াছিল, ক্রমে সেই কথা বৃদ্ধ জনার্দ্দনের কর্ণে উঠিল।

জনার্দ্দন সরল ও নির্ম্মলচরিত্র, তথাপি জনার্দ্দন রাজপুত, সকল রাজপুত ব্রাহ্মণের ন্যায় অতিশয় বংশমর্য্যাদাগর্ব্বী। যখন শুনিলেন, আপনার একমাত্র দুহিতা একজন সামান্য মহারাষ্ট্র সৈনিককে বিবাহ করিতে চাহে, বিদ্রোহীর সহিত বিবাহ করিয়া কুলে কলঙ্ক আনিতে চাহে; তখন জনার্দ্দনের নয়ন আরক্ত হইল, বৃদ্ধের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া বালিকাকে "পাপীয়সী," "পিশাচী" বলিয়া গালি দিলেন, সরযু পিতার তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলেন, জগতে এরূপ কি যাতনা আছে হৃদয়বল্লভের জন্য নারী যে যাতনা সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ?

বৃদ্ধ বাতুলের ন্যায় একমাত্র দুহিতাকে শোকার্ত্ত নীরব দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন, সরযুকে ক্রোড়ে লইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন—

"দেখ দেখি মা! আমার মস্তকে একটী কেশও কৃষ্ণ নাই, এই বৃদ্ধবয়সে কি তুমি আমাকে যাতনা দিবে?" উঃ! সে সস্নেহ ভর্ৎসনা সরযু সহ্য করিতে পারিলেন না, পিতার কণ্ঠ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, পিতাও রোদন করিলেন।

বৃদ্ধ সরযুর সখীদিগের দ্বারা সরযুকে অনেক বুঝাইলেন, অন্য যুবকের সহিত সরযুর বিবাহ স্থির করিতে চাহিলেন, সরযুর পিতার কুল-গৌরবের কথা অনেক বলিলেন।

সরযুর একই উত্তর, "পিতাকে বলিও আমার বিবাহে রুচি নাই, চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব।"

বৃদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে শোকার্ত্ত হইতেন, ক্ষণে ক্ষণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। একদিন ক্রোধপরবশ হইয়া সরযুকে বলিলেন—

"সরযু! আমি রাজপুত, রাজপুতেরা কন্যার অবমাননা দেখিবার পূর্ব্বে কন্যার হৃদয়ে ছুরিকা স্থাপন করে, চরণদিগের গীতে এরূপ শুনিয়া থাকিবে।"

ধীরে ধীরে সরযু উত্তর করিলেন—

"পিতা, সেইরূপ জনকই যথার্থ দয়ালু! পিতা, আপনিও যদি সেইরূপ আচরণে আমার হৃদয়ের অসহ্য বেদনা শান্ত করেন, আমি জন্মে জন্মে আপনার দয়ার কীর্ত্তন করিব।"—বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে গৃহ ত্যাগ করিলেন

ক্রমে চারিদিকে একথা বিস্তার হইতে লাগিল, মন্দ লোকে আরও দুই একটী কথা বাড়াইল,—কেহ কেহ বলিতে লাগিল, জনার্দ্দনের কন্যা ব্যভিচারিণী; তাহার বিবাহ হইতেছে না।

যেদিন জনার্দ্দন এই কথা শুনিলেন, তাঁহার কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল; গৃহে আসিয়া কন্যাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

"পাপীয়সি, তোর জন্য কি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অবমানিত হইব? তুই তোর পিতার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবি? আমার বাটী হইতে দূর হ।"

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণনয়নে সরযু উত্তর করিলেন—

"পিতা! আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া থাকি, মার্জ্জনা করুন, কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমা হইতে আপনার অবমাননা হইবে না।"

এ কথার অর্থ তখন জনার্দ্দন বুঝিলেন না, এ কথার অর্থ তাহার পরদিন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন।

সেইদিন অন্ধকার নিশীথে সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা একাকিনী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন, একাকিনী সংসারের বিস্তীর্ণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

"দুঃখে সুখে খুল্লনা শরৎকাল ভাবে।
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ।
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস॥"

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

শরৎকালের প্রাতের কমনীয় আলোকে বেগবতী নীরানদী বহিয়া যাইতেছে, সূর্য্যকিরণে জলের হিল্লোল হাস্য করিতে করিতে যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উভয় পার্শ্বে সুন্দর শস্যক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পূজায় যেন সন্তুষ্ট হইয়া মেদিনী সেই হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্য করিতেছে। উত্তর ও পূর্ব্বদিকে সেইরূপ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা সুদূরে দুই একটী গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্ব্বতরাশির উপর পর্ব্বতরাশি বাল-সূর্য্যকিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করিতেছে।

সেই নদীকূলে শ্যামলক্ষেত্রবেষ্টিত একটী সুন্দর গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল, গ্রামের এক প্রান্তে একটী কৃষকের কুটীরের নিকট একটী বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে একজন দাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কৃষকপত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সম্ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটী গোলাঘর রহিয়াছে, পার্শ্বে চারি পাঁচটী গরু বাঁধা রহিয়াছে, বাটীর ভিতর তিন চারিখানি ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ হয়, গৃহস্বামী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন "মাতব্বর" লোক,—ব্যবসা ও মহাজনী কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া, শ্যামবর্ণ, চঞ্চল, প্রফুল্ল ও উজ্জ্বলনয়না। একবার নদীকূলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে একবার মাতা যে ঘরে রন্ধন করিতেছে, তথায় দৌড়াইয়া যাইতেছে, এক একবার বা দাসীর নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে, অথবা প্রফুল্লতার হাস্য হাসিতেছে।

বালিকা বলিল, "দিদি, আয় না কাল্‌কের মত ঘাটে যাই, কাপড় দিয়া মাছ ধরিব।"

দাসী। "না দিদি, মা বারণ করিয়াছেন, ঘাটে যেও না।"

বালিকা। "মা টের পাবে না।"

দাসী। "না, ছি, মা যা বারণ করেন তা করিতে নাই, মার কথা কি অন্যথা করে।"

বালিকা। "আচ্ছা দিদি, মা কি তোরও মা হয়?"

দাসী হাসিয়া বলিল—"হয় বৈ কি।"

বালিকা। "না, সত্য করিয়া বল।"

দাসী। "সত্যই মা হয়।"

বালিকা। "না দিদি, তুই যে রাজপুতের মেয়ে, আমরা তো রাজপুত নয়।"

দাসী বালিকাকে চুম্বন করিয়া বলিল, "এতদূর যদি জ্ঞান তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?"

বালিকা। "জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই মাকে মা বলিস্ কেন?"

দাসী। "যিনি আমাকে খাইতে পরিতে দিতেছেন, যিনি আমাকে থাকিবার স্থান দিয়াছেন,—যিনি আমাকে মেয়ের মত লালনপালন করেন তাঁকে মা বলিব না ত কি বলিব? এজগতে আমার অন্য স্থান নাই, মা আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন।"

বালিকা। "ছি দিদি, তোর চক্ষে জল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস্ কেন দিদি ?"

দাসী। "না দিদি, কাঁদ্‌ব কেন ?"

বালিকা। "তোর চক্ষে জল দেখ্‌লে আমার চক্ষে জল আসে কেন দিদি ?"

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিল,—"তুমি যে আমাকে ভালবাস।"

বালিকা। "আর তুই আমাকে ভালবাসিস্ ?"

দাসী। "বাসি বৈ কি।"

বালিকা। "বরাবর ভাল বাস্‌বি, কখনও আমাকে ভুল্‌বি নি ?"

দাসী। "না, আর তুমি, দিদি তুমি আমাকে ভালবাস্‌বে, কখনও ভুলিবে না ?"

বালিকা। "না।"

দাসী। "হাঁ, তুমি আমাকে একদিন ভুল্‌বে।"

বালিকা। "কবে ?"

দাসী। "যবে তোমার বর আস্‌বে।"

বালিকা। "সে কবে !"

দাসী। "আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই।"

বালিকা। "না দিদি, তখনও তোকে ভুলিব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভালবাস্‌ব। আর তুই দিদি—তোর যখন বর আস্‌বে তখন আমাকে ভুল্‌বিনি ?"

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, তাহা মোচন করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—

"না, তখনও ভুলব না।"

বালিকা। "বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাস্‌বি ?"

দাসী হাস্য করিয়া বলিল, "সমান সমান।"

বালিকা। "তোর বর কবে আস্‌বে দিদি ?"

দাসী। "ভগবান্ জানেন ! ছাড়, রান্নার বেলা হইয়াছে, আমি যাই।" দাসী অন্ন প্রস্তুত করিতে গেল।

পাঠককে বলা অনাবশ্যক যে, অনাথিনী সরযুবালা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাটীতে দাস্যবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনী ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের

অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহযুক্ত, নিরাশ্রয় রাজপুতকন্যাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত, নিরাশ্রয় ভদ্র রাজপুতকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার ন্যায় লালনপালন করিতেন। সরযুও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুইবেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, সুতরাং কৃষক ও কৃষকপত্নীর কার্য্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরযুর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথের অবর্ত্তমানে যদি সরযুর কোথাও সুখের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরল গৃহিণীর বাটীতে থাকিয়া সরযু পরম সুখলাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে, কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটী পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটী ত্যাগ করিয়াছে; শেষে যে একটী কন্যা হইয়াছিল, পিতা মাতা উভয়েই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্য্যে বা অন্য কার্য্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরযু গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন, "বাছা, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব।" সরযু সস্নেহে উত্তর করিতেন, "মা, তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও।" স্নেহবাক্যে সরলস্বভাব বৃদ্ধ গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন, "সরযু! বাছা তোর মত মেয়ে কখনও দেখি নাই, তোমার মত আমাদের জাতির একটী মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দি।" পুত্র অনেকদিন গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীনা ক্ষণেক রোদন করিতেন।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়াছেন, একপ্রান্তে সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন,—

"গৃহিণী, শান্ত হও, আজ সুসংবাদ আছে।"

গৃহিণী। "আহা! তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পাইয়াছ?"

গোক। "শীঘ্রই পাইব, পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল,—অদ্য শুনিলাম শিবজী দুষ্ট বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন, আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবেন।"

গৃহিণী। "আহা ভগবান্ তাহাই করুন, প্রায় একবৎসর হইল বাছাকে না দেখিয়া যে মন কি অবস্থায় আছে তাহা ভগবানই জানেন।"

গোক। "ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হাবেলদারের অধীনে কার্য্য করিত, রঘুনাথজীর সম্বাদ পাইয়াছি।"

সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উদ্বেগে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—

"যেদিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন সেদিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল মনে আছে?"

গৃহিণী। "আমি মেয়েমানুষ আমার কি অত মনে থাকে?"

গোক। "পুত্র বলিয়াছিল 'পিতা, রঘুনাথজী যদি বিদ্রোহী হয়েন তাহা হইলে আমি যেন কখনও খড়্গ ধারণ করিতে না পারি। আমি হাবেলদারকে চিনি, তাঁহার ন্যায় বীর শিবজীর সৈন্যে আর নাই, কি ভ্রমে পতিত হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন,—পশ্চাৎ জানিবেন, তখন রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন।' পুত্রের কথা এত দিনে সত্য হইল।"

সরযুর হৃদয় উল্লাসে উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, তাঁহার মস্তক হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল। এ উদ্বেগ অসহ্য।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন—

"রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেন, আপন কৌশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আপন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন; শুনিয়াছি, শিবজী সাশ্রুনয়নে আপন দোষের ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, হাবেলদারের পদ হইতে একেবারে 'পাঁচহাজারী' করিয়া দিয়াছেন। সহরে অন্য কথা নাই, হাটে বাজারে অন্য কথা নাই, গ্রামে অন্য কথা নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্বকথা শুনিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধন্যবাদ দিতেছে।"

আনন্দে, উল্লাসে সরযুর হৃদয় একেবারে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল,—রমণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, চীৎকার শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন দর্শন।

" বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন লইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কেহ মোর কাছে। IX/V
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একূলে ওকূলে গোকূলে দুকূলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটী কমল পায়॥"

চণ্ডীদাস।

অনেক শুশ্রূষায় সরযু চেতনা প্রাপ্ত হইলেন, হৃদয়ে সহসা বেদনা পাইয়াছিলেন বলিয়া গোকর্ণও তাঁহার স্ত্রীকে ভুলাইলেন, কিন্তু সেই অবধি উদ্বেগে সরযুর আহার নিদ্রা নিয়মানুসারে হইত না, দিন গণিতেন, প্রহর গণিতেন, দণ্ড গণিতেন, সময়ে সময়ে পদশব্দে চকিত হইতেন। চিন্তায় ও অতিশয় উদ্বেগে শরীরে রোগের সঞ্চার হইতে লাগিল।

এক দিন, দুই দিন, দশ দিন, এক মাস অতিবাহিত হইল, রঘুনাথ আসিলেন না। তখন সরযু আর সহ্য করিতে পারিলেন না; চিন্তায় শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে শরীর জ্বালা করিত, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা যাইতেন।

রঘুনাথ জীবিত আছেন সরযু তাহা জানিলেন, রঘুনাথ তবে আসেন না কেন? সরযুকে কি বিস্মৃত হইয়াছেন! বজ্রাঘাতের ন্যায় সরযুর হৃদয়ে এই ভীষণ চিন্তার আঘাত হইল। দিন দিন সরযুর হৃদয়ে এই চিন্তা প্রবল হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় সরযু নদীকূলে একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণের কন্যা আসিয়া ধীরে ধীরে সরযুর পার্শ্বে বসিয়া বলিল,—

"দিদি! তোর বুকে বেদনা হইয়াছে তবে তুই অত ভাবিস্ কেন? ভাব্‌লেই ও বেদনা বৃদ্ধি হয়।"

সর। "না দিদি, ভাব্‌লে বেদনা একটু কমে, সেই জন্য ভাবি।"

বালি। "তুই কি ভাবিস্ দিদি? তোর বরের কথা বুঝি ভাবিস্?"

সরযু সজলনয়নে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ, বরের কথাই ভাবি।"

বালি। "বর কবে আসিবে ?"

সর। "বর আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে।" সরযুর মুখে হাস্য, চক্ষে জলবিন্দু !

বালি। "তবে কি হবে ?"

সর। "আর একজন বর আমাকে বিবাহ করিবে।"

বালি। "সে কে দিদি ?"

সর। "যম।"

বালি। "সে কে ?"

সর। "আমার মত যাহাদের বরে ভুলিয়া যায়, যম তাহাকে বিবাহ করে।"

বালি। "তাহার ত বড় দয়ার শরীর।"

সর। "অতিশয় দয়ার শরীর ; আহা ! কবে সে আমাকে নেবে ?"

বালি। "সে তোকে বিবাহ করিলে তোর পীড়া আর থাকিবে না ?"

সর। "না ; সমস্ত কষ্ট নিবারণ হবে। হা জগদীশ্বর !"

বালি। "সে কবে আসিবে ?"

সর। "শীঘ্র।"

ক্ষণেক এইরূপ কথার পর বালিকা শয়ন করিতে গেল,—সরযু একাকিনী সেই নদীকূলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

রজনী জগতে গভীর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল, আকাশে তারাগুলি মিট্ মিট্ করিতেছে, সম্মুখে নদী কুল কুল শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সরযু নদীর দিকে চাহিলেন, পার্শ্বস্থ কুঞ্জবনের দিকে চাহিলেন, শেষে সেই নৈশ আকাশের দিকে চাহিলেন। অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

সরযু কি ভাবিতেছিলেন ? অভাগিনী ভাবিতেছিলেন ;—

"বিধাতা যদি আমাকে চিরদুঃখিনী করিতেন, কায়িক পরিশ্রমে যদি জীবনধারণ করিতে হইত, ভগ্ন কুটীরে যদি বাস করিতে হইত, ভিক্ষা করিয়া যদি দিনযাপন করিতে হইত, হৃদয়েশ ! সরযু তোমাকে পাইলে এ সমস্ত উল্লাসে সহ্য করিত ! পিতা দূর করিয়াছেন, মাতা বাল্যকালে ত্যাগ করিয়াছেন, হৃদয়নাথ, তাহা সহ্য করিয়াছি ! লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিয়াছে, জগতে নিন্দা করিয়াছে, নাথ, তাহাও সহ্য করিয়াছি, তোমার চিন্তা করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছি, জগতে এরূপ কি আছে অভাগিনী তোমার জন্য যাহা সহ্য করিতে না পারে ? রোগ, শোক, পরিতাপ, বিধাতা যে কোন

ক্লেশ এ দুঃখিনীকে দিতেন, নাথ! তোমাকে পাইলে সমস্ত সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু সরযুর জীবন এখন শূন্য! নাথ, চিরজীবী হও, তোমার যশ, তোমার মান, জগতে বিস্তার হউক ;—অভাগিনীকে বিদায় দাও! আমার আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।” নয়নজলে বালিকা শরীর আর্দ্র করিল। শেষে শ্রান্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—“বাল্যকালে মাতাকে হারাইলাম, যৌবনে ধর্ম্মপরায়ণ পিতা হারাইলাম। নাথ! অদ্য তুমিও অভাগিনীকে পায়ে ঠেলিলে। তোমাকে নিন্দা করি না, জীবিত থাকিতে সরযু যেন তোমার নিন্দা না করে। আমারই ভাগ্যদোষে তোমাকে পাইলাম না, আমি যে চির-অভাগিনী।”

অসহ্য বেদনায় শিরে করাঘাত করিয়া সরযু মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ সেই অন্ধকার রজনীতে সেই সুন্দর নদীতীরে সরযু মুর্চ্ছিতা হইয়া রহিলেন, ক্রমে শীতল বায়ুতে চেতনা হইল, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের ন্যায় পুর্ব্বচিন্তা হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল।

বোধ হইল যেন সেই দেববিনিন্দিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন সেই মধুময় কথাগুলি শুনিতে পাইলেন, “সরযু, সরযু, আমাকে ক্ষমা কর আমি তোমার রঘুনাথ।”

সরযু নয়ন উন্মীলিত করিলেন,—সহসা তারকালোকে সেই দীর্ঘাকার বীরপুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিলেন,—বাহুদ্বয় সরযুর দিকে প্রসারিত, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ!

এ কি রোগীর স্বপ্নমাত্র? বিধাতা! এ বিড়ম্বনা কি জন্য? সরযু নয়ন পুনরায় মুদিত করিলেন।

এ স্বপ্ন নহে, এ বিড়ম্বনা নহে! সরযু পুনরায় চাহিলেন, কি দেখিলেন?

দেখিলেন, হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, উঃ! সরযুর তপ্তহৃদয় সেই প্রশান্ত হৃদয়ে শীতল হইল, সরযুর ঘনশ্বাসের সহিত রঘুনাথের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল, সরযুর কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল!

উঃ! সে স্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল, বালিকা সংজ্ঞাশূন্য! এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন?

আনন্দভরে বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযু মনে মনে বলিলেন, “জগদীশ্বর! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখনিদ্রা হইতে কখনও না জাগরিত হই!”

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন নির্ব্বাণ।

"হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন্।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন॥
ধর্ম্ম অনুসারে জয় ঈশ্বর বচন।"
কাশীরাম দাস।

মহারাষ্ট্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল! শিবজী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, ম্লেচ্ছদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল।

এদিকে রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে তাঁহার সৈন্য সমেত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন বিজয়পুর ত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় কার্য্য করিলেন। আরংজীব তাঁহার প্রতি এরূপ অভদ্র আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও সম্রাটের কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না। যখন নিশ্চয় দেখিলেন মহারাষ্ট্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তখন পর্য্যন্ত যতদূর সাধ্য সম্রাটের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করিলেন। লোহগড়, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে, সম্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, তদ্ভিন্ন যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন যেন শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এ জগতে এরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার নাই; জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণদেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে "তলব" করিলেন, যশোবন্তসিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধ্যমতে দিল্লীর কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন; শেষদশায় এ অবমাননায় তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পথেই মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইলেন!

অবমানিত, পীড়িত, বৃদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়িত রহিয়াছেন, এরূপ সময় একজন দূত সংবাদ দিলেন—

"মহারাজ একজন মহারাষ্ট্র সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী। তিনি বলিলেন, "যে তিনি আপনার চরণোপান্তে বসিয়া একদিন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর একদিন উপদেশ পাইবার আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন।"

রাজা উত্তর করিলেন—

"সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইস। তিনি দিল্লীর শত্রু, কিন্তু দূতরূপে আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে নির্ভয় দিতেছি, রাজপুতের বাক্যের অন্যথা হয় না।"

ক্ষণেক পর একজন মহারাষ্ট্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন—

"সুহৃদ্বর শিবজী! মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার দেখা হইল চরিতার্থ হইলাম। উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না, আসন গ্রহণ করুন।"

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন, "পিতঃ! যখন শেষ আপনার নিকট বিদায় লইয়াছিলাম তখন আপনাকে এত শীঘ্র এরূপ অবস্থায় দেখিব কখন মনে করি নাই।"

জয়। "রাজন্! মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি।" ক্ষণেক পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমরা মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলাম; এখন কি দেখিতেছ?"

শিব। "মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি তখন মোগল সাম্রাজ্যের আর আশা নাই।"

জয়। "বৎস! তাহা নহে। রাজস্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে অন্য জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের ন্যায় সহস্র যোদ্ধা এখনও বর্ত্তমান আছেন। তাদৃশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

শিব। "আপনার অমঙ্গল অপেক্ষা সাম্রাজ্যের অধিক কি অনিষ্ট হইতে পারে?"

জয়। "শিবজী! একজন যোদ্ধা যাইলে অন্য যোদ্ধা হয়, কিন্তু পাত্রকে যে ক্ষয়সাধন করে তাহার পুনঃসংস্কার হয় না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যথায় পাপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও মৃত্যু। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।"

শিব। "নিবেদন করুন।"

জয়। "যখন আপনাকে আমি দিল্লী পাঠাইয়াছিলাম তখন আপনার হৃদয়ও দিল্লীশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, আপনার স্থির সঙ্কল্প ছিল, দিল্লীশ্বর যতদিন আপনাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি ততদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আপনার প্রতি সদাচরণ করিলে সম্রাটের দক্ষিণ দেশে একজন পরাক্রান্ত বন্ধু থাকিত, কপটাচরণ বশতঃ সেইস্থানে একজন দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়াছেন।"

শিব। "মহারাজ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, জগতে যথার্থই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।"

জয়। "আরও শ্রবণ করুন! আমি আরংজীবের পিতার সময় হইতে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছি। বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যতদূর সাধ্য, দিল্লীশ্বরের উপকার করিয়াছি। স্বজাতি, বিজাতি বিবেচনা করি নাই, আত্মপর বিবেচনা করি নাই, যাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি জীবন পণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়াছি। বৃদ্ধকালে সম্রাট্ আমার প্রতি প্রথমে অসদাচরণ করিলেন, পরে অবমাননা করিলেন। সেজন্য আমার কার্য্যে বৈলক্ষণ্য নাই, আমি যে সমস্ত সৈন্য প্রধান প্রধান দুর্গে রাখিয়া যাইলাম, শিবজী, তাহারা বিনা যুদ্ধে আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না! কিন্তু এ আচরণে আরংজীব স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। অম্বরাধিপেরা দিল্লীশ্বরের চিরবিশ্বস্ত অনুচর ও সহায়, অম্বরের ভবিষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রধান শত্রু হইবে।"

ক্রোধে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, মহাত্মা জয়সিংহ সে ক্রোধ নিবারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"দুইটী উদাহরণ দিলাম, মহারাষ্ট্রদেশের ও অম্বরদেশের। সমস্ত ভারতবর্ষে এইরূপ। শিবজী! আরংজীব সমস্ত ভারতবর্ষে বিশ্বস্ত অনুচরের অবমাননা করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন, বারাণসী মন্দির বিনষ্ট করিয়া তথায় মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে, সর্ব্বদেশে হিন্দুদিগের অবমাননা করিতেছেন, হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া করস্থাপন করিতেছেন।" ক্ষণেকপরে নয়ন মুদিত করিয়া অতি গম্ভীরস্বরে পুনরায়

কহিতে লাগিলেন—যেন মৃত্যুশয্যায় মহাত্মার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,—"শিবজী! আমি দেখিতেছি যে, এই কপটাচারিতায় চারিদিকে যুদ্ধানল প্রজ্জলিত হইল, রাজস্থানে অনল প্রজ্জলিত হইল, মহারাষ্ট্রে অনল জ্বলিল, পূর্ব্বদিকে অনল জ্বলিল! আরংজীব বিংশতি বৎসর যত্ন করিয়া সে অনল নির্ব্বাণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহার অসামান্য কৌশল, তাঁহার অসাধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; বৃদ্ধবয়সে পশ্চাৎ তাপ করিয়া দিল্লীশ্বর প্রাণত্যাগ করিলেন! অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক্ হইতে ধূধূ শব্দে জ্বলিতেছে, সেই অনলে মোগল সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল! তাহার পর? তাহার পর মহারাষ্ট্রজাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীয়গণ! অগ্রসর হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর।"

রাজার বচন রোধ হইল। চিকিৎসকেরা পার্শ্বে ছিলেন, তাঁহারা নানা ঔষধি দিলেন, কিন্তু জয়সিংহ অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে বলিলেন, "কপটাচারী আপনাকেই শাস্তিদান করে, সত্যমেব জয়তি।"

শ্বাসরোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ নির্গত হইল।

শিবজী বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; মৃত জয়সিংহের পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন প্রভাত।

"ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!"
মধুসূদন দত্ত।

রজনী এক প্রহর মাত্র আছে এরূপ সময়ে শিবজী রাজপুত-শিবির ত্যাগ করিলেন। বাহিরে আসিয়া একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন, চিনিলেন তিনি রাজা জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলিলেন, "রাজন্! মহারাজা জয়সিংহ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পর আপনার হস্তে এই সমস্ত কাগজ

দিব। এতদিন এ সমস্ত সাবধানে রাখিয়াছিলাম, আপনি এক্ষণে গ্রহণ করুন।"

শিবজী সে সময়ে অতিশয় শোকার্ত্ত ছিলেন; কোন উত্তর না করিয়া সেই কাগজ লইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই প্রধান প্রধান সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করিলেন। ক্ষণেক পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত সৈন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন—

"বন্ধুগণ! প্রায় এক বৎসর হইল আমরা আরংজীবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলাম; আরংজীবের নিজের দোষে ও কপটাচারিতায় সে সন্ধি খণ্ডন হইয়াছে; অদ্য আমরা সে কপট আচরণের পরিশোধ করিব,—মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিব।

"যিনি আরংজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ঈশানীদেবী যাঁহার সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন, যাঁহার নিকট শিবজী বিনা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন; অদ্য নিশীথে সেই মহাত্মা রাজা জয়সিংহ আরংজীবের অসদাচরণে ভগ্নচেতা হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সৈন্যগণ! দিল্লীতে আমার কারাবরোধ, হিন্দুপ্রবর জয়সিংহের মৃত্যু, এ সমস্ত এক্ষণে আমরা পরিশোধ করিব!

"চারিদিকে চাহিয়া দেখ, চারিদিকে হিন্দুর অবমাননা,—হিন্দুদেবের অবমাননা, দেবালয়ের অবমাননা। হিন্দুগণ, অদ্য আমরা এ অবমাননা দূর করিব; এ শোক, এ অবমাননার যদি পরিশোধ থাকে, বীরগণ! রণরঙ্গে আমরা ইহার পরিশোধ করিব।

"মৃত্যুশয্যায় রাজা জয়সিংহের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখিলেন মোগলদিগের ভাগ্যনক্ষত্র অবনতিশীল,—মহারাষ্ট্রদিগের ভাগ্যনক্ষত্র উন্নতিশীল,—দিল্লীর সিংহাসন ত্বরায় শূন্য হইবে; বন্ধুগণ অগ্রসর হও, যুধিষ্ঠির ও পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার করিব।

"পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখিতে পাইতেছ, ও প্রভাতের রক্তিমাচ্ছটা। কিন্তু ও আমাদিগের পক্ষে সামান্য প্রভাত নহে; মহারাষ্ট্রগণ! হিন্দুগণ! অদ্য আমাদের জীবন প্রভাত।"

সমস্ত সেনানী ও সৈন্যগণ এই মহৎ বাক্য শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "অদ্য আমাদের জীবন প্রভাত।"

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

“পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।”

কাশীরাম দাস।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী নদীতীরে পদচারণ করিতেছিলেন; আপনার পদোন্নতি, সরযুর সহিত পুনর্ম্মিলন, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দুদিগের ভাবী স্বাধীনতা, এইরূপ নববিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিলেন—

“রঘুনাথ!”

রঘুনাথ পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলেন চন্দ্ররাও জুম্‌লাদার! রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু ঈশানী-মন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই।

চন্দ্ররাও বলিলেন, “রঘুনাথ! এ জগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই, একজন মরিব।”

রঘুনাথ রোষ সম্বরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, “চন্দ্ররাও! কপটাচারী মিত্রহন্তা চন্দ্ররাও! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরচ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন,—জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।”

চন্দ্র। “বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই। তোমার আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথা শুন।

“জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমি তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাকে আমি বিষচক্ষুতে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছে! তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয়নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিদ্রোহী বলিয়া অবমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি! চন্দ্ররাওয়ের ভীষণ জিঘাংসা তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইয়াছিল।

“তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নতপদ লাভ করিয়া সৈন্যমধ্যে আসিয়াছ। চন্দ্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা জীবনে কখনও নিষ্ফল হয় নাই, এখনও হইবে না। অন্য উপায় ত্যাগ করিলাম, এই অসিদ্বারা তোর হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া এ ভীষণ পিপাসা নির্ব্বাণ করিব। ভীরু! তোর অদ্য আমার হস্তে রক্ষা নাই।”

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতেছিল, কম্পিতস্বরে বলিলেন—"পামর! সম্মুখ হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব, সহসা তোর পাপের দণ্ড দিব।"

চন্দ্র। "ভীরু! এখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তবে আরও শোন্। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল সে শত্রুনিক্ষিপ্ত নহে, চন্দ্ররাও তোর পিতৃহন্তা!"

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কর্ণে শুনিতে পাইলেন না, রোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া চন্দ্ররাওকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্ররাওও ক্ষীণহস্তে অসি ধারণ করেন নাই, অনেক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার ন্যায় উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। চন্দ্ররাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন, অনেক্ষণ যুদ্ধের পর চন্দ্ররাওকে পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জানু স্থাপিত করিলেন; বলিলেন—

"পামর! অদ্য তোর পাপরাশির শেষ হইল, পিতা! আপনার মৃত্যুর পরিশোধ হইল।"

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্ররাও নির্ভীক; বিকট হাস্য হাসিয়া বলিলেন, "আর তোর ভগ্নী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া সুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" পুনরায় হাস্য করিয়া উঠিলেন।

বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত কথা তখন রঘুনাথের মনে উপলব্ধি হইল! এইজন্য লক্ষ্মী স্বামীর নাম করেন নাই, এইজন্য চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন! পিতৃহন্তা রক্তপিশাচ চন্দ্ররাও বলপূর্ব্বক প্রাণের লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছে! রোষে রঘুনাথের নয়ন দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল; দন্ত কড়মড় করিল; কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না; তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্ররাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

কম্পিতস্বরে কহিলেন, "পিশাচ! তোর পাপ জগদীশ্বর বিচার করুন, রঘুনাথ তোর দোষের দণ্ড দিতে অক্ষম!"

"দোষের, বিদ্রোহিতার দণ্ড দিতে আমি অক্ষম নহি" বলিয়া পশ্চাৎ হইতে একজন লোক নিকটে আসিলেন, রঘুনাথ চাহিয়া দেখিলেন শিবজী!

শিবজী ইঙ্গিত করাতে অন্তরাল হইতে চারিজন সৈনিক আসিল, চন্দ্ররাওয়ের হস্ত বদ্ধ করিয়া তাহাকে বন্দীস্বরূপ লইয়া গেল!

পরদিন প্রাতে চন্দ্ররাওয়ের বিচার। রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রঘুনাথকে কল্য অন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রুদ্রমণ্ডলদুর্গ আক্রমণপূর্ব্বে শত্রু রহমৎখাঁকে গুপ্ত সংবাদ দিয়াছিলেন, পরে সে দোষে রঘুনাথকে দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অদ্য তাহারই বিচার!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আফ্‌গানসেনাপতি রহমৎখাঁ রুদ্রমণ্ডলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎখাঁও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন তখন রহমৎখাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটী যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হয়েন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা করাইয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎখাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন জয়সিংহ রহমৎখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “খাঁ সাহেব! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত যত্ন ও চিকিৎসা বৃথা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।”

রহমৎখাঁ বলিলেন—“আমার মরণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্তু আপনি শত্রু হইয়া আমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করিয়াছেন তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না, এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন, আপনার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই।”

রাজা জয়সিংহ বলিলেন, “রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের পূর্ব্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল; সে কে আমরা জানি না, আমার বোধ হয় একজন অন্যায় দণ্ডিত হইয়াছে।”

রহমৎ। “আমি জীবিত থাকিতে সে নাম প্রকাশ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। রাজপুত! আপনার ভদ্রাচরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি, কিন্তু পাঠান প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত।”

জয়সিংহ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, “যোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোনও নিদর্শন থাকে তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?”

হমৎ। “প্রতিজ্ঞা করুন, সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঠ
বন না।”

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন; তখন রহমৎখাঁ তাঁহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন।

রহমতের মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দ্ররাও!

চন্দ্ররাও রহমৎখাঁকে স্বহস্তলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে কাগজ ছিল তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্ররাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন তাহার প্রাপ্তিস্বীকার পর্য্যন্ত রাজা জয়সিংহ দেখিলেন।

জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচারকার্য্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন, যখন পাঠ সমাপ্ত হইল তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্ররাও বিদ্রোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দ্দোষী নিষ্কলঙ্ক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এ কথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন—"পাপাচারী বিদ্রোহী, তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে?"

মৃত্যুর সময়ও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় দর্প ও অভিমান এখনও পূর্ব্ববৎ। বলিলেন—

"আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার ক্ষমতা প্রসিদ্ধ! একদিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর একদিন আর এক জনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন চন্দ্ররাও এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানে না, এ সমস্ত প্রমাণ মিথ্যা।"

এই বিদ্রূপে শিবজী মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন—

"জল্লাদ, চন্দ্ররাওয়ের দুই হস্ত ছেদন কর; তাহা হইলে আর ঘুষ লইতে পারিবে না, তাহার পর তপ্ত লৌহদ্বারা ললাটে "বিশ্বাসঘাতক" অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।"

জল্লাদ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে যাইতেছিলেন এরূপ সময় রঘুনাথ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমার একটী নিবেদ আছে।

শিব। "রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব, কেননা এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।"

রঘুনাথ। "মহারাজের অঙ্গীকার অলঙ্ঘ্য, আমি এই প্রতিহিংসা যাচ্ঞা করি, যে চন্দ্ররাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে;—অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্ত দিন্!"

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ!

শিবজী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন—

"তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল,—তোমার অনুরোধে সেজন্য চন্দ্ররাওকে ক্ষমা করিলাম। রাজবিদ্রোহাচরণের শাস্তি দিবার অধিকারী রাজা। সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি, জল্লাদ, আপন কার্য্য কর।"

রঘু। "মহারাজের বিচার অনিন্দনীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তিদান করুন।"

শিব। "এ ভিক্ষাদানে আমি অসমর্থ, রঘুনাথ তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম,—অন্যকে এতদূর ক্ষমা করিতাম না।" শিবজীর নয়ন প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল।

রঘু। "প্রভু দুই একটী যুদ্ধে এ দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, অদ্য সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্ত করুন।"

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতেছিল; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! রঘুনাথ! কখন কখন আমাদের উপকার করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য আমাদিগের বিচার অন্যথা করিতে চাহ? রাজ-আদেশ অন্যথা হয় না; তুমিও আপনার বীরত্বের কথা আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও!"

এ তিরস্কার-বাক্যে রঘুনাথের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে উত্তর করিলেন,—

"প্রভু! পুরস্কার চাহা দাসের অভ্যাস নাই। অদ্য জীবনের মধ্যে প্রথমবার পুরস্কার চাহিয়াছি, প্রভু যদি এ পুরস্কার দানে অসম্মত হয়েন, দাস দ্বিতীয়বার চাহিবে না। দাসের কেবল এইমাত্র ভিক্ষা, প্রভু সদয় হইয়া তাহাকে বিদায় দিন্, রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করিবে, পুনরায় গোস্বামী হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে।"

শিবজী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, রঘুনাথের নিকট কত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন স্মরণ করিলেন,—রঘুনাথের চক্ষুতে জল দেখিয়া কাতর হইলেন, ক্রোধ বিলুপ্ত হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"রঘুনাথ! তোমার যাচ্ঞা দান করিলাম; চন্দ্ররাওকে মুক্ত করিলাম; রঘুনাথ! যে ব্রত ধারণ করিয়াছ তাহাতেই অবস্থিতি কর,—চিরকাল শিবজীর দক্ষিণহস্তের ন্যায় হইয়া থাকিও!"

সভাসদ্ সকলে নিস্তব্ধ! সকলে ঘৃণার সহিত চন্দ্ররাওয়ের দিকে চাহিলেন,—

ঘোর অভিমানী চন্দ্ররাও সাধারণের এ ঘৃণা ও নিন্দাবাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না, রঘুনাথের দয়াতে তাঁহার রক্ষা হইল এ কথা সহ্য করিতে পারিলেন না।

চন্দ্ররাও ভীরু নহেন। ধীরে ধীরে ক্রোধ-জর্জ্জরিতশরীরে রঘুনাথের নিকট যাইয়া বলিলেন,—

"বালক! তোর দয়া আমি চাহি না, তোর দেওয়া জীবন আমি তুচ্ছ করি, তোর অনুগ্রহে আমি এইরূপে পদাঘাত করি," বলিতে বলিতে রঘুনাথের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। পরক্ষণে আপন ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অভিমানী ভীষণপ্রতিজ্ঞ চন্দ্ররাও জুমলাদার সাধারণের ঘৃণা হইতে আপনার চিরনিষ্কৃতি সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেহ সভাস্থলে পতিত হইল!

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ভগিনী।

"সুত পরিবার,
কেবা বল কার,
যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব প্রায়,
সকল মিছাময়,
কেবল ভবের মায়া॥"
কীর্ত্তিবাস ওঝা।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে; এক্ষণে নায়ক-নায়িকাদিগের বিষয় দুই একটী কথা বলিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট বিদায় লইব।

বৃদ্ধ জনার্দ্দন কন্যাকে হারাইয়া বাতুলের ন্যায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযুকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, “সরযু! সরযু! তোমার ন্যায় রত্ন আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম? তোমাকে ত্যাগ করিয়া কি একদিনও জীবনধারণ করিতে পারি?” সরযুও পিতার গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—“পিতা, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, জীবন থাকিতে আর কখনও আপনার ছাড়া হইব না।”

পুলকিতহৃদয়ে বৃদ্ধ শুনিলেন যে রঘুনাথ রাজপুতসন্তান, অতি উন্নত রাঠোরবংশীয় বীরপ্রবর গজপতিসিংহের পুত্র; সানন্দহৃদয়ে শুভদিনে কন্যা দান করিলেন। সরযুর সুখ কে বর্ণনা করিবে? চারি বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষদেবকে যখন আপন কোমল হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তাঁহার ওষ্ঠে যখন উষ্ণ ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন সরযু সুখে উন্মাদিনী হইলেন। যাঁহারা সে সুখ ভোগ করিয়াছ, অনুভব কর, লেখক বর্ণনায় অক্ষম!

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদুর্গে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কি অদ্য সার্থক হইল? সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সরযুর হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিন্দিত দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সেই বিশাল স্নেহপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন!

সরযু তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া “দিদি” কে বিস্মৃত হইলেন না। রঘুনাথের অনুরোধে শিবজী গোকর্ণকে একটী জায়গীর দান করিলেন ও গোকর্ণের পুত্র ভীমজীকে উন্নতি দান করিয়া হাবেলদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরযু দিদিকে সর্ব্বদাই আপন গৃহে রাখিতেন ও বরের সহিত “সমান সমান” ভাল বাসিতেন,—কয়েক বৎসর পরে একটী সদ্বংশীয় সুচরিত্র পাত্র দেখিয়া দিদির বিবাহ দিলেন। বিবাহদিবসে সরযু ও রঘুনাথ স্বয়ং উপস্থিত রহিলেন; সরযু কন্যার কাণে কাণে বলিলেন,—“দেখিও দিদি! যাহা বলিয়াছিলে সে কথা যেন রাখিও,—বরের চেয়ে আমাকে ভাল বাসিবে!”

রঘুনাথ আখ্যায়িকাবিবৃত সময়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যশোবন্তসিংহ যখন জানিতে পারিলেন রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয় অনুচর গজপতিসিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে পৈতৃক ভূমি সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন, তাহা ন্ন অনেক জায়গীর দান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে ইতে দিলেন না, যতদিন জীবিত ছিলেন, রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন।

পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দে চৈত্র মাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, যখন শিবজীর অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী পিতার পুরাতন ভৃত্যদিগকে একে একে অবমানিত বা কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন; রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপকার নাই দেখিয়া সরযু ও জনার্দ্দনের সহিত স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, পৈতৃক জায়গীর অধিকার করিলেন, পৈতৃক প্রশস্ত গৃহ রঘুনাথ ও সরযুর বালকবালিকাদিগের ক্রীড়াশব্দ ও হাস্যধ্বনিতে শব্দিত হইতে লাগিল!

পাঠক! ইচ্ছা, এই স্থানেই আপনার নিকট বিদায় লই, কিন্তু আর এক জনের কথা বলিতে বাকি আছে; শান্ত চিরসহিষ্ণু লক্ষ্মীরূপিণী লক্ষ্মীর কি হইল?

যেদিন চন্দ্ররাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ অনতিবিলম্বে ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন; যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আলুলায়িতবেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন মোহ যাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন! হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ যাতনা হয় কে বর্ণনা করিতে পারে? অদ্য লক্ষ্মীর নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়াছে, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে! শোকে, বিষাদে, নৈরাশে, নব বৈধব্যের অসহ্য যাতনায়, বিধবা ঘন ঘন আর্ত্তনাদ করিতেছে!

রঘুনাথ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, সান্ত্বনা দূরে থাকুক, লক্ষ্মী প্রাণের ভ্রাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন লক্ষ্মীর নয়নে জল নাই, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ সুন্দর শুভ্র সুগন্ধ পুষ্প দিয়া সাজাইতেছেন। বালিকা যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া পুত্তলি সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূপ মনোনিবেশপূর্ব্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদু পদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হইলে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে! অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—

"ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল আমার পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোনও কষ্ট থাকিল না।"

সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ বলিলেন—"প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি?"

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন—

"সত্য ভাই তোমার দয়ার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের জন্য রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে শুনিয়াছি। আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।" নিজের চক্ষু হইতে, একবিন্দু জল মোচন করিলেন।

রঘু। "লক্ষ্মী! তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকাল জানি, অসহ্য শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মনুষ্যের জীবন শোকময়, তোমার কপালে যাহা ছিল ঘটিয়াছে, সে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর, আইস, আমার গৃহে আইস, ভ্রাতার ভালবাসায় ভ্রাতার যত্নে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ত্রুটি করিব না।"

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন, সে হাস্য দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন—

"ভ্রাতা, তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সান্ত্বনা করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। হৃদয়েশ্বর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় দাসীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।"

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শান্তভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন; লক্ষ্মী সহমরণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন; ধীর শান্ত লক্ষ্মীর একই উত্তর—"হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।"

অবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন,—

"লক্ষ্মী, একদিন আমার জীবন নৈরাশে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগিনী, তোমার প্রবোধে, তোমার স্নেহময় কথায় সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্য্যজগতে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্মী, তুমি কি ভ্রাতার কথা রাখিবে না? তুমি কি ভ্রাতাকে ভাল বাস না?"

লক্ষ্মী পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন—

"ভাই, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা শুনিয়াছিলে তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্যম, অনেক অবলম্বন, একটী যাইলে অন্যটী থাকে, একটী চেষ্টা নিষ্ফল হইলে দ্বিতীয়টী সফল হয়। ভাই তুমি সেদিন ভগিনীর কথাটী রাখিয়াছিলে, অদ্য তোমার কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুযশ দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অদ্য আমি যে নয়নের মণিটী হারাইয়াছি তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভাল বাসিতেন, এত অনুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ, অদ্য সদয় হও। লক্ষ্মীর একমাত্র সুখের পথে কাঁটা দিও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন তাঁহার সহিত যাইতে দাও!"

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন; স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বালিকার ন্যায় ঝর ঝরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসার কপট সংসারে ভ্রাতা ভগিনীর অখণ্ডনীয় প্রণয়ের ন্যায় পবিত্র স্নিগ্ধ প্রণয় আর কি আছে? স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় যাইলে পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল, চন্দ্ররাওয়ের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল, হাস্যবদনা লক্ষ্মী সুন্দর পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

চিতাপার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর-বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্বিনী-দিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূলি লইলেন, সপত্নীদিগের আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন, সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্যদ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে রঘুনাথের নিকট আসিলেন,—

বলিলেন," ভাই! বাল্যকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে তুমি বড় ভালবাসিতে, অদ্য লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অদ্য চিরসুখিনী হইবে, একবার ভালবাসার কায কর,—সস্নেহে কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।"

রঘুনাথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দুটী হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন! লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল।

সস্নেহে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন—

"ছি ভাই, শুভকার্য্যে চক্ষুর জল ফেল কি জন্য? পিতার ন্যায় তোমার সাহস, পিতার ন্যায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জগদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করিবেন; জগৎ তোমার যশে পূর্ণ হইবে! লক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘুনাথকে সুখে রাখেন! ভাই, বিদায় দাও, দাসীর জন্য স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।"

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

"লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছজ্ঞান হইতেছে, জগতে আর রঘুনাথের কি আছে? প্রাণের লক্ষ্মী! তোকে কিরূপে বিদায় দিব, তোকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?" আর্ত্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষুর জল মুছিয়া দিলেন, অনেক সান্ত্বনা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, "ভ্রাতঃ তুমি বীরশ্রেষ্ঠ! পুরুষের যাহা ধর্ম্ম তাহা তুমি পালন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর ধর্ম্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব করিও না, বাধা দিও না; ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।"

গদ্ গদ্‌স্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—

"লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এ জগতে তোমাকে বিদায় দিলাম, ঐ আকাশে ঐ পুণ্যধামে আর একবার তোমাকে পাইব। সে পর্য্যন্ত জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম।"

ভ্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন, "হৃদয়েশ্বর! জীবনে তুমি দাসীকে বড় ভাল বাসিতে, এখন অনুগ্রহ কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন তোমাকে স্বামী পাই,—জন্ম জন্ম যেন লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পায়। জগদীশ্বর! লক্ষ্মীর অন্য কামনা নাই।"

ধীরে ধীরে চিতা আরোহণ করিলেন, স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তিভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নয়ন মুদিত করিলেন,—বোধ হইল যেন সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জ্বলিল; অতিশয় ঘৃত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লেহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবমান হইল। লক্ষ্মীর একটী অঙ্গ নড়িল না, একটী কেশ কম্পিত হইল না।

এক প্রহরের মধ্যে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য, চিতার সেই নৈরাশজনক ধূ ধূ শব্দ রঘুনাথ জীবনে বিস্মৃত হইলেন না।

সমাপ্ত।